দিন শেষে

রবিন জামান খান

হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে এক রোগির মৃত্যুর পরই সক্রিয় হয়ে উঠলো একাধিক গোষ্ঠি। ভয়ঙ্কর মানুষগুলোর উদ্দেশ্য একদমই অজানা। বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাতে অজ্ঞাত একজনের সাহায্য নিতে হয় ডাক্তার তুলিকে। অজ্ঞাত সেই লোকের উদ্দেশ্যও অস্পষ্ট। কাকে বিশ্বাস করতে হবে আর কার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে সে জানে না। দিন শেষে ক্ষমতা, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রতিহিংসার পর কার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়?

দিন শেষে পাঠক খুঁজে পাবেন এর জবাব।

দিন শেষে

রবিন জামান খান

বাতিঘর প্রকাশনী

দিন শেষে

রবিন জামান খান

Din Seshe

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : একশত সত্তুর টাকা মাত্র

উৎসর্গ :

আমার স্ত্রী সুপ্ত জামানকে...

ডাক্তার

ইমার্জেন্সি এরিয়া, লাইফ-লাইন হাসপাতাল
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
রাত–১০:২৫

বিরক্তির সাথে আরেকবার ঘড়ি দেখলো তুলি। ডিউটি শেষ হতে আরো প্রায় একঘন্টা বাকি। সময়টা যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না আজ। এই সময়ে ইমার্জেন্সিতে রোগির ভিড় কমই থাকে কিন্তু আজ একেবারেই নেই। বিগত পাঁচঘন্টা ধরে বসে বসে বই পড়া ছাড়া অন্য কোন কাজই ছিল না ওর। আজ দু-সপ্তাহ ধরে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাও ডি-অ্যাকটিভ করে রেখেছে, তাই ফেবু'তেও ঢোকার কোন ইচ্ছে নেই। ইমার্জেন্সিতে ডাক্তারদের রুমে একটা এলসিডি টিভি থাকলেও ওটা ছাড়তে এতোটুকু ইচ্ছে করছে না। ওর সাথে একজন দেখা করতে আসার কথা, সে-ও আসেনি। ভেবেছিল মানুষটা এলে, কথা বললে, ভালো লাগবে। এমনিতেই গত কয়েকদিন ধরে মনটা অসম্ভব খারাপ, তার ওপর বিরক্তিকর সময় কাটানোর কারণে অসহ্য লাগছে।

বইটা ডেস্কের ওপর উল্টে রেখে রুমের এক কোনায় রাখা ইলেকট্রিক কেটলিটা অন করে দিলো ও। বয়াম থেকে দু-চামচ কফি মগে নিয়ে তার সাথে এক চামচ চিনি নিলো। এই মুহূর্তে মন খারাপের একমাত্র ঔষধ–কড়া কফি। তুলির অন্য কোন নেশা নেই কিন্তু সে ভয়াবহ কফি আসক্ত। দিনে অন্তত ছয়-সাত কাপ কফি না হলে ওর চলে না। কফিটাও হতে হয় মনমতো, একটু কড়া। মেশিনের কফি কখনোই খায় না সে, সুযোগমতো নিজেই বানিয়ে নেয়। বাসায় অফিসে সবখানে ওর কফি বানানোর ব্যবস্থা আছে।

ইলেকট্রিক কেটলিতে পানি ফুটতে লাগলো। ফুটন্ত পানি মগের ভেতরে ছেড়ে দিতেই কফির সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো ঘরে। কফি বানানো শেষ করে মগটা হাতে নিয়ে রুমের বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বেশিরভাগ হাসপাতালের মতো এই সুবিশাল হাসপাতালেরও ইমার্জেন্সি এরিয়া নিচতলায়। মেট্রনকে জানালো ওপরে যাচ্ছে, যদি কোন ইমার্জেন্সি দরকার পড়ে তবে যেন ওকে কল দেয়া হয়। বয়স্ক মেট্রন একটু বাঁকা চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে কফির মগের দিকে তাকালো।

"কি, হয়েছে, কোন সমস্যা?" তুলি জিজ্ঞেস করলো তাকে।

মেট্রন কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ালো। তুলি গট-গট করে হেটে তার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। মেট্রনের বাঁকাচোখে তাকানোর কারণটা ও বুঝতে পেরেছে। সব হাসপাতালের মতো এখানেও ডাক্তার আর নার্সদের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। তার ওপর মেট্রনরা হলো নার্সদের লিডার। এই মেট্রন আবার বাকি সব মেট্রনদেরও নেত্রি, সেইসাথে কী কী সব সংগঠনের হোমরা-চোমরা। এ-ধরনের মানুষের মধ্যে সবসময়ই জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর খবরদারি করার মনোভাব দেখা যায়। যেহেতু ইমার্জেন্সি ডিউটিতে ডাক্তারদের বাইরে যাবার নিয়ম নেই সেজন্যে মেট্রন বাঁকাচোখে ওর দিকে তাকাচ্ছিলো। ও নিশ্চিত, এই ব্যাপারটা সিনিয়র ডাক্তারদের কাছে লাগবে। লাগালে লাগাক, তুলি ওসব কেয়ার করে না।

কফির কাপ নিয়ে ও চলে এলো দোতলায়। এখানে সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা রুমে প্রবেশ করে ওটার বাইরের দরজা খুলে সোজা চলে এলো ছোট একটা টেরেসে। এটা ওর খুব প্রিয় একটা জায়গা। এখান থেকে চট্টগ্রাম শহরের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। রাতের শহর দেখতে দেখতে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলো। আচমকা ওর চোখে ভেসে উঠলো বাবার মুখটা। কিছুদিন আগে মারা গেছে, বাবাকে শেষবারের মতো একবার দেখতেও পারেনি। বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে ওর পরিবারের শেষ মানুষটিও হারিয়ে গেছে। রক্তের সম্পর্কের আর কেউই রইলো না। কেন জানি ঝাপসা হয়ে এলো তুলির চোখ।

ওরা ছিল দুই ভাই-বোন। ওর ভাই ওর থেকে এক বছরের বড়। ভাইয়ের নাম ছিল রঙ, আর ওর নাম তুলি। মা ছবি আঁকতে অনেক পছন্দ করতেন, তাই ওদের এমন নাম রেখেছিলেন। একটা সময় আর দশটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই সুন্দর পরিবার ছিল ওদের। তারপর এলো সেই দিন। ওর ভাই মারা গেল এক দুর্ঘটনায়–আর এই ঘটনাটার সবচেয়ে বাজে প্রভাব পড়লো ওর বাবার ওপরে। বদলে গেল মানুষটা। তারপর একটা সময় ওদেরকে ছেড়েই চলে গেল। তারপর আর কোনদিনই

বাবাকে আপন করে পায়নি সে। ছোটবেলা থেকেই মায়ের কাছে মানুষ হয়েছে। মা ছিলেন স্কুল-টিচার। স্বাভাবিকভাবেই তার উপার্জন ছিল সীমিত। খুবই সাদামাটাভাবে জীবন-যাপন করেছে ওরা। ছোটবেলা থেকেই ও ছিল মেধাবি। স্কুল, কলেজ, তারপর মেডিকেল কলেজ। কিন্তু মা ওর সাফল্য শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে পারলেন না, মেডিকেল ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক দু-দিন আগে মারা গেলেন। মায়ের মৃত্যুর সময়েই ও শেষবার দেখেছিল বাবাকে। মা মারা যাবার পর বাবার কান্না দেখে তুলির মনে হয়েছিলো, উনি ওদেরকে ছেড়ে চলে গিয়ে যে ভুল করেছিলেন সেটা বুঝতে পেরেছেন শেষ বয়সে।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবা ওকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিল তার সাথে যেতে, কিন্তু ও যায়নি। একটা সময়ের পর থেকে মা কখনোই যে-মানুষটাকে মেনে নিতে পারেননি, তার মৃত্যুর পর সেই মানুষটার সাথে চলে যাওয়াটা হতো ওর মৃত মায়ের জন্যে সবচেয়ে বড় অপমান। তাই সেবার বাবাকে রুক্ষভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে কথাটা ভেবে এখন আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে। ওর বাবার হয়তো অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু...

তুলি মনে মনে ভাবলো, মানুষের স্মৃতির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ কতো কম। আজকের কর্মফল কাল কতোটা কষ্ট দিতে পারে সেটা যদি মানুষ বুঝতে পারতো তবে কতোই না ভালো হতো।

"ম্যাডাম," হঠাৎ পেছনে থেকে বেশ জোরে ডাক শুনে চিন্তার সূতো ছিড়ে গেল ওর। পেছনে ঘুরতেই চোখে পড়লো এক জোড়া মোটা-মোটা চশমার কাঁচ থেকে আসা আলোর প্রতিফলন; বাল্বের আলোয় কাঁচ জোড়া টর্চ লাইটের মতো জ্বলছে। ইমার্জেন্সি এরিয়ার ওয়ার্ড বয়। গলার আওয়াজ শুনে চিনতে না পারলেও চশমার মোটা কাঁচ দেখে সাথে সাথে চিনতে পারলো। এতো মোটা লেন্সের চশমা পরতে ও আর কাউকে দেখেনি।

ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো, "ইমার্জেন্সিতে এক রোগি এসেছে। অবস্থা খুব খারাপ। মেট্রন আপা এক্ষুণি আপনাকে যেতে বলেছেন।"

তুলি কিছু না বলে ছেলেটার পিছু পিছু রওনা দিলো।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছেলেটা জানালো রোগির অবস্থা খুবই খারাপ। যেকোন সময় কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। তুলি জানতে চাইলো

রোগির সাথে আর কে কে আছে। জবাবে ছেলেটা যা জানালো সেটা শুনে ওর ভ্রু কুঁচকে গেল। লোকটা একাই এসেছে! তুলির কাছে অদ্ভুত লাগলো ব্যাপারটা। ইমার্জেন্সিতে একজন রোগি ক্রিটিক্যাল অবস্থায় চলে এসেছে একা একা। যদিও অনেক সময়ই এরকমটা দেখা যায়। বয়স্ক কোন রোগি হঠাৎ স্ট্রোক করে বসেছে, বাসায় কেউ নেই, হাসপাতাল হয়তো বাসার কাছেই, তাই একাই চলে এসেছে। একবার এক রোগি মাইনর স্ট্রোক-করা অবস্থায় নিজে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে চলে এসেছিল–এরকম ঘটনাও আছে ওর অভিজ্ঞতায়।

ছেলেটার পিছু পিছু প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ইমার্জেন্সিতে ঢুকে তুলি দেখতে পেলো টেবিলের ওপরে বয়স্ক এক লোক শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে আছে মেট্রন-নার্সসহ আরো দুয়েকজন ওয়ার্ড বয়।

"ভিড় করবেন না এখানে," বলে রোগির দিকে এগিয়ে গেল সে। মেট্রনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "সিনিয়র ডাক্তাররা কেউ আছেন?"

"না, নেই। রাতের এসময় খুব বেশি কেউ থাকে না। সার্জারিতে যার ডিউটি ছিলো উনি অসুস্থ বলে আজ অসেননি," কথাটা বলেই একটু থেমে নিচুস্বরে বলল সে, "ম্যাডাম, একটা কথা ছিলো।"

তুলি একটু বিরক্ত হলো। "আমি রোগিকে আগে দেখে নেই, তারপর..." মেট্রনের জবাবের অপেক্ষা না করেই রোগির দিকে ভালো করে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে।

রোগির পুরো শরীর থেকে শুরু করে মুখ, গলা এমনকি হাতও রক্তাক্ত। একজন নার্স ক্রমাগত রোগির রক্ত মুছে চলেছে। তবে একটু মুছতেই তার জায়গা দখল করছে আরো কয়েকগুন বেশি রক্ত। অবাক বিষয়, লোকটার এতো রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিন্তু এখনো সে জ্ঞান হারায়নি। তুলি এগিয়ে গিয়ে অন্য একজন নার্সকে নির্দেশ দিলো লোকটার গায়ের শার্ট কেটে ফেলতে, ক্ষতস্থান না দেখলে বুঝতে পারছে না কিসের ক্ষত।

একজন ওয়ার্ড-বয় লোকটার শরীর তুলে ধরতেই নার্স তার গায়ের শার্টটা কেঁচি দিয়ে কেটে ফেললো। এরপর তুলির নির্দেশে তাকে চিৎ করে শোয়ানো হলো। লোকটার বুকে বা শরীরের সামনের অংশে কোন ক্ষতই নেই। সাথে সাথ তুলি আবারো উল্টো করে শোয়াতে বলল রোগিকে। সেটা

করতেই যা দেখতে পেলো তাতে গা শিউরে উঠলো ওর। মানুষটার পিঠে আর কাঁধে অন্তত তিনটা গুলির চিহ্ন। গুলির আঘাতগুলো দেখে গা গুলিয়ে উঠলো। এরকম ভাইটাল জায়গায় তিনটা গুলি খাবার পরও লোকটা এখন পর্যন্ত টিকে আছে। ডাক্তারিতে নতুন হলেও এগুলো যে গুলির আঘাতের চিহ্ন এটা সে ভালোভাবেই চিনতে পেরেছে। কিছুদিন আগে ওর ইন্টার্নশিপের শুরুর দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে গুলি খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওই ছেলেটার গুলির ক্ষতগুলো ছিলো হুবহু এরকম। লোকটা এতোক্ষণ চোখ বন্ধ করে গোঙাচ্ছিল, হঠাৎ একটু নড়ে উঠলো।

"উনাকে তো...গুলি করা হয়েছে," তুলি আনমনেই বলে উঠলো।

"হ্যা, ম্যাডাম...আমি তখন আপনাকে এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আপনি তো আমার কথাই শুনলেন না," মেট্রন শক্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। "এইসব কেস হ্যান্ডেল করা খুব ঝামেলার। পুলিশকে জানাতে হয়। ওরা এসে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে। আরো কতো কি। আমি বলি কি, এই রোগিকে ফিরিয়ে দেই...সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই?"

মেট্রনের কথা শেষ হবার আগেই তুলি ভীষণভাবে চমকে উঠলো। ওরা দাঁড়িয়ে আছে রোগিকে রাখা টেবিলটার ঠিক পাশেই, হঠাৎ রোগি কাঁপতে কাঁপতে একটা হাত বাড়িয়ে তুলির হাতটা চেপে ধরলো। চমকে উঠলেও তুলি বোঝার চেষ্টা করলো রোগি আসলে কী করতে চাইছে। ওর হাত ধরে টানতে টানতে বিড় বিড় করছে আহত মানুষটি। সম্ভবত কিছু একটা বলতে চাইছে।

"সবাই সরে দাঁড়ান, প্লিজ।"

কথাগুলো বাকিদের উদ্দেশ্যে বলে তুলি নিচু হয়ে নিজের মুখটা নিয়ে গেল লোকটার মুখের কাছে। একদম বিড় বিড় করে কথা বলছে। ভালো করে খেয়াল করার পর শুনতে পেলো কথাগুলো। ফ্যাঁসফ্যাসে গলায় নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে লোকটা একটানা প্রায় তিন মিনিট কথা বলে গেল। কথা শেষ হবার সাথে সাথে নেতিয়ে পড়লো একেবারে। চমকে উঠলো তুলি। মানুষটা কি মারা গেল? পালস চেক করলো সে। না, এখনো বেঁচে আছে।

ও মেট্রনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "এক্ষুণি একে অপারেটিং টেবিলে নিয়ে যান!"

"ম্যাডাম, আপনি নতুন, এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই। পরে বিপদে পড়বেন," মেট্রন নির্বিকার কণ্ঠে বলল। "সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই...কি বলেন?"

ইমার্জেন্সি রুমের সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দু-জনার দিকে। পরিবেশের উত্তাপ ওরাও টের পেয়েছে।

রাগের চোটে তুলির পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল। এক পা এগিয়ে গেল মেট্রনের দিকে, "আমার কথা আপনার কানে যাচ্ছে না? একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, আর আপনি আছেন পুলিশি ঝামেলা নিয়ে! আর কোন কথা শুনতে চাই না। আমি যা বলছি সেটাই করুন, এক্ষুণি।"

মেট্রন কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও চুপ হয়ে গেল। তুলির কথামতো নার্স এবং ওয়ার্ড বয়দেরকে চেঁচিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে শুরু করলো সে।

নিজের রুমে ঢুকে দ্রুত পোশাক পাল্টে প্রস্তুতি নিয়ে ফেললো তুলি।

রোগিটাকে নিয়ে শেষপর্যন্ত ওরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলো না। সত্যি কথা হলো, অপারেটিং টেবিলে শোয়ানোর পরই তুলি বুঝতে পারে লোকটা মারা গেছে।

মারা যাবার ব্যাপারটা কমফার্ম করে বাকিদেরকে বলল অন্যান্য সবকিছু গোছাতে। কাজ সেরে ও বাকিদের সাথে রওনা দিলো ইমার্জেন্সি রুমের দিকে। রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে অন্যদের সাথে কথা শেষ করে ওখান থেকে চলে এলো নিজের রুমে। ওয়াশরুমে ঢুকে ফ্রেশ হলো, শাওয়ার নিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে বেসিনের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। এমনিতেই ওর মন অসম্ভব খারাপ ছিলো, তার ওপর এরকম একটা ঘটনা, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললো। অনেকক্ষণ একটানা কেঁদে নিজেকে অনেকটা ধাতস্থ করে আরেক কাপ কফি নিয়ে টেবিলে এসে বসলো।

ঘড়িতে সময় দেখলো, অনেকক্ষণ আগেই ওর ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। ও এখন চাইলে বেরিয়ে যেতে পারে। তার আগে কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে। একটু পরেই ওয়ার্ড-বয় প্রয়োজনীয় কাগজগুলো নিয়ে এলো,

কাজ সেরে ও বেরুতে যাবে ছেলেটা একটা ব্যাগ দেখিয়ে বলল, ঐ লোকটার সাথে ছিলো এটা। তুলি ব্যাগটা হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলো। একেবারেই সাধারণ একটা ব্যাগ। ভেতরে কয়েকটা অতি-সাধারণ জরুরি জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেই। ও ব্যাগটা ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ব্যাগটা মারা যাওয়া মানুষটার অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে রেখে দাও। পুলিশ এসেছে?"

"না, ম্যাডাম। খবর দেয়া হয়েছে কিন্তু এখনো আসেনি। ম্যাডাম, আপনি কি পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?"

তুলি ঘড়ি দেখলো। পুলিশের সামনে পড়লেই হাঙ্গামা, বেশ দেরি করিয়ে ফেলবে। কিন্তু ওকে এখন যেতে হবে, আজ রাতে জরুরি কাজ আছে। একটু ভেবে সে বলল, "না, আমি চলে যাবো।"

ছেলেটা বিদায় নিতেই তুলি নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে সোজা চলে এলো তিনতলায়। বেরুবার আগে এখানেই ওকে ডিউটি রেজিস্টারে সই করতে হয়। ওপরে এসে দেখলো রেজিস্টারে সই করার টেবিলে যে-লোকটার বসে থাকার কথা সে নেই। সম্ভবত আশেপাশে কোথাও বিড়ি টানতে গেছে। লোকটাকে কয়েকদিনই ও দেখেছে ডিউটির সময় এদিক-সেদিক দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে। ও রেজিস্টারে সই করে কল লগ দেখার জন্যে হ্যান্ডব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে দেখতে যাবে তার আগেই ফোনটা বাজতে লাগলো। একটা আননোন নম্বর। কলটা রিসিভ করলো সে, "হ্যালো।"

অন্যপাশে নীরবতা।

"হ্যালো, কে বলছেন?"

তারপরও কোন জবাব নেই।

"ধুর," বিরক্ত হয়ে কলটা কেটে দিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো গান শুনতে শুনতে। কয়েক ধাপ নামতেই মোবাইলটা আবারো বিপ্ করে উঠলো। এবার কল নয়, মেসেজ এসেছে। তুলি একবার ভাবলো ফোনটা বের করবে না কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো। ওই নম্বরটা থেকেই একটা টেক্সট এসেছে। টেক্সটটা পড়ে একটু চমকে উঠলো সে।

আপনি খুব বিপদের মধ্যে আছেন। নিচতলায় যাবেন না।

তুলি মেসেজটা দেখে একটু শিউরে উঠলো। কেউ কি ওকে ফলো করছে? একটু ইতস্তত করে আবারো নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে, চলে এলো ফার্স্ট ফ্লোরে। আবারো ফোনটা বিপ্ করে উঠলো।

কিছু লোক আপনাকে খুঁজছে।

আগেরবার টেক্সট দেখে ওর গা শিউরে উঠেছিল, খানিকটা ভয়ও লেগেছিল। এবারেরটা দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার। নিশ্চিত কেউ ফাজলামি করছে ওর সাথে। সেটা অফিসের কেউ হবার সম্ভবনাই বেশি। ওর মনে হচ্ছে এটা আর কেউ না, ঐ আসিফ ছেলেটাই হবে। রিসেপশনিস্ট আসিফের সাথে ওর সম্পর্ক খুব ভালো, ওকে আপু বলে ডাকে আর সারাক্ষণ দুষ্টামি করে। তার ধারণা, ওই ছেলেটাই নতুন কোন নম্বর থেকে মেসেজ পাঠিয়ে তার সঙ্গে এই দুষ্টামি করছে। ছেলেটাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ও নিচের ফ্লোরে এসে আসিফের ডেস্কের সামনে ওকে খুঁজলো। এক আয়া জানালো আসিফ নাকি আজ দিনেই ডিউটি করে সন্ধ্যার আগে চলে গেছে। কথাটা শুনে তুলির ভ্রু একটু কুঁচকে উঠলো। আসিফ ছাড়া অফিসের আর কেউ ওর সাথে এরকম ফাজলামি করার সাহস রাখে না। কথাটা ভাবতে ভাবতে চলে এলো হাসপাতালের সামনের দিকে। আর একটা করিডোর পার হলেই হাসপাতালের প্লাজা এরিয়ায় পৌছে যাবে। আসলেই কি ও কোন বিপদে পড়েছে? কিছু লোক ওকে খুঁজছে? একটু দ্বিধার সাথেই সামনের করিডোর ধরে হাটতে লাগলো। এই করিডোরটা শেষ হলেই সামনের রিসেপশন গ্রাউন্ডে বের হয়ে যাবে। ওই জায়গাটাকেই বলা হয় প্লাজা এরিয়া।

করিডোরের শেষ মাথায় এসে থেমে গেল। মনে সামান্য সন্দেহ আর দ্বিধা থাকার কারণেই কিনা কে জানে, করিডোর থেকে বেরুবার আগে রিসেপশন গ্রাউন্ডের দিকে একবার উঁকি দিলো আড়াল থেকে। ঠিক তক্ষুনি চোখে পড়লো লোকটাকে, অবশ্যই এ-লোক হাসপাতালের কেউ না, এরকম সাড়ে ছয়-ফুটি লম্বা আর ন্যাড়া মাথার কেউ এই হাসপাতালে কাজ করে ব'লে তুলির জানা নেই। এছাড়া হাসপাতালের কেউ এরকম পোশাক পরবেও না। বহুধরনের রোগির সাথে বহু ধরণের মানুষ আসে কিন্তু তাদের

কেউই এই গরমে জ্যাকেট পরার মতো বোকামি করবে বলে মনে হয় না। লোকটা জ্যাকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা ধরে রেখেছে। অবশ্যই কোন একটা অস্ত্রই হবে সেটা–তুলি আন্দাজ করলো। লোকটা একটু সরে যাবার সাথে সাথেই ওর চোখে পড়লো আরো দু-জনকে। ঠিক তার ওপাশেই দাঁড়িয়ে আছে। এতোক্ষণ লোকটার বিশাল আয়তনের কারণে এদেরকে চোখে পড়েনি। আকারে ছোট হলেও এই দু-জনও ওই লোকটারই কপি। উদ্ভট পোশাক অর আগ্রাসি আচরণ। এ সময় আবার তার মোবাইলটা টিং টিং করে বেজে উঠলো। আরেকটা মেসেজ এসেছে :

এবার বিশ্বাস হলো আমার কথা? জলদি পালান। ওরা আপনার ক্ষতি করবে।

তুলি মেসেজটা পড়ে শুধু চমকে উঠলো না, রীতিমতো ভড়কে গেল। ও মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলো বিশালদেহি লোকটা কাউন্টারের ওপাশে বসে থাকা রিসেপশনিস্টকে একহাতে ধরে কাউন্টারের অনেকখানি ওপরে তুলে ফেলেছে। তার অন্যহাতে একটা বড় সাইজের পিস্তল। রিসেপশনিস্টকে আরেকটা ঝাঁকি দিতেই সে এদিকটা দেখিয়ে দিলো, ঠিক যেখানে তুলি এখন দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনেই একসাথে ঘুরে তাকালে তুলি চট করে সরে গেল একপাশে। আরেকবার মাথা বের করে উঁকি দেয়ার সাহস হলো না। আর দেখার প্রয়োজনও নেই। ও জানে লোকগুলো এগিয়ে আসছে এদিকেই। এক মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো, একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ও কি পালাবে? নাকি লোকগুলোর মুখোমুখি হবে? ওর কি নিজের ওপর আস্থা রাখা উচিত, নাকি টেক্সট পাঠানো লোকটার কথার ওপরে? ওরা তো ওর খোঁজে না-ও এসে থাকতে পারে। আবারো মেসেজ :

আমার কথা শুনুন, করিডোর দিয়ে বিল্ডিংয়ের পাশে চলে যান।

অনেক সময় এরকম হয়, কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়লে মুহূর্তের

জন্যে মানুষ খেই হারিয়ে ফেলে, তারপর একটা শক্ত ধাক্কা খেয়ে ধাতস্থ হয়। তখন ঠিকই মাথাটা কাজ করে। এক মুহূর্তের জন্যে তুলিরও ওরকম হয়েছিল। মেসেজটা ওর জন্যে ধাক্কার মত কাজ করলো। মুহূর্তে ফিরে এলো বাস্তবে, সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলো পালাতে হবে। এদের হাতে ধরা পড়া চলবে না।

তুলি মনে মনে হিসেব করে ফেললো, রিসেপশনের প্লাজা এরিয়াটা অনেক বড়, লোকগুলো পুরোটা পার না হতে পারলেও মাঝামাঝি চলে এসেছে নিশ্চই। ও চেষ্টা করলেও এখান থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে দিয়ে প্লাজা এরিয়া পার হয়ে মেইনগেট পর্যন্ত যেতে পারবে না। তার মানে, ওকে পেছনে দিকেই যেতে হবে। সাথে সাথে করিডোর ধরে উল্টোদিকে ছুটতে আরম্ভ করলো সে।

ছুটতে ছুটতেই ভাবতে লাগলো, পেছন দিকে গেলে ওর জন্যে তিনটে রাস্তা আছে। ও পেছনের একটা ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে বেরুতে পারে অথবা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে ওপরে। তা না-হলে ফায়ার-এস্কেপ দিয়ে, সেটা শুরু হয়েছে দোতলা থেকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, প্রথমটাই করবে। হাসপাতাল ভবনের পেছন দিকে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি আনা-নেয়া থেকে শুরু করে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারিদের চলাচলের জন্য একটা বেশ বড় গেটের মতো আছে। এই গেটটাই আবার হাসপাতালের পেছন দিকের আঙিনায়, যেখানে আউটডোর অবস্থিত সেখানে যাতায়াতের রাস্তা হিসেবেও ব্যবহার করে অনেকে। ওই গেটটা দিয়ে একবার বেরুতে পারলে ওখান থেকে গ্যারাজে যেতে পারবে, গ্যারাজে ওর স্কুটিটা রাখা আছে। তুলি পাগলের মতো ছুটতে লাগলো সেদিকে।

রাতের বেলা এ-সময়ে হাসপাতালে খুব বেশি লোকজন নেই। অল্প-স্বল্প যে-দুয়েকজন আছে তারা এমনভাবে তাকে দেখতে লাগলো যেন সে বুঝি পাগল হয়ে গেছে। তুলি ভ্রুক্ষেপ না করে ছুটতে লাগলো। অনেকটা দৌড়ে আরেকটা করিডোর পার হয়ে ওটার দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করে উঁকি দিলো। মনে মনে ক্ষীণ আশা, হয়তো লোকগুলো ওকে খুঁজতে আসেনি, ওরা ওর পিছুও নিচ্ছে না। কিন্তু ওকে হতাশ করে দিয়ে ঐ তিনজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো করিডোরে। লম্বা লোকটার হাতে এখনো পিস্তল ধরা। লোকজন দেখেও ওটা আড়াল করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা

করছে না সে। তুলি ওদেরকে দেখার সাথে সাথে আড়ালে চলে গেলেও একজন দেখে ফেললো ওকে। হাত তুলে বাকি দু-জনের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো। ওদের হাটা পরিণত হলো দৌড়ে।

তুলি এক ঝটকায় দরজার পেছন থেকে সরে ছুটতে লাগলো উল্টোদিকে। হাসপাতালের পেছনের গেটের কাছে যেতে হলে ওকে আরেকটা নির্জন করিডোরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সেটা না করে ও দৌড়ে ঢুকে পড়লো একটা ওয়ার্ডে। এখানে বেশ কিছু রোগি আছে। বেশিরভাগ রোগি আর তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা ঘুমের আয়োজন করতে ব্যস্ত। ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে অনেকেই। ও কোনদিকেই না তাকিয়ে একটানা ছুটতে লাগলো। ওয়ার্ডের ভেতর দিয়ে যাবার সময়ে এর-ওর গায়ে ধাক্কা লেগে পড়ে যেতে যেতে রক্ষা পেলো কোনমতে। একবার ভাবলো ওয়ার্ডের ভেতরেই অপেক্ষা করে, এখানে লোকজন আছে, এতো মানুষের সামনে ওরা কিছু করার সাহস পাবে না, কিংবা ওয়ার্ডের ভেতর থেকেই হাসপাতালের সিকিউরিটিকে ফোন করে ডেকে আনবে। কিন্তু যেভাবে সবার সামনে লোকগুলো রিসেপশনিস্টকে শূণ্যে তুলে ফেলেছিল, যেভাবে সবার সামনেই পিস্তল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে করে আইডিয়াটা বাতিল করতে বাধ্য হলো।

তুলি ছুটতে ছুটতেই ওয়ার্ডের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো খোলা বারান্দায়। এই খোলা বারান্দা পার হতে পারলেই পেছনের গেট, আর সেটা পার হতে পারলেই মুক্তি। কথাটা মাথায় আসতেই ওর ভয় অনেকটা কমে গেল, দৌড়ানো থামিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে হাটতে শুরু করলো এবার। শেষ মুহর্তে কারো চোখে পড়তে চাইছে না। আর একটু এগোলেই কাঁচের বড় গেটটা।

গেটের ঠিক আগে একটা করিডোরের অন্ধকার মুখ পার হবার সময় ভেতর থেকে শক্তিশালী একটা হাত ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে গুলিয়ে উঠলো তুলির পেট। ভয় আর আতঙ্কের একটা ঢেউ খেলে গেল সারা শরীরে। সেই ঢেউ গলার কাছাকাছি এসে রূপ নিলো চিৎকারে। চিৎকারটা মুখ দিয়ে বের হবার আগেই শক্ত একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরলো। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, "যদি বাঁচতে চান, একদম চুপ থাকুন।"

লোকটা ওকে একটানে নিয়ে এলো করিডোরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে।

তুলি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। লোকটা ওকে ভীষণ শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে নিজের শরীরের সাথে। ওর মনে হলো ভয়ে যেকোন সময় অজ্ঞান হয়ে যাবে। তবে অবাক হয়ে খেয়াল করলো, ওকে ধরে থাকা হাতটা ছেড়ে দিয়ে সামনে আলোকিত বারান্দার দিকে ইশারা করছে লোকটা। ওদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, একটু আগে দেখা তিনজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল আকারের লম্বুটা তার দুই সঙ্গির সাথে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে আর কিছু একটা খুঁজছে।

"ওরা আপনাকেই খুঁজছে," কণ্ঠটা আবারো শান্ত স্বরে বলল।

তুলি দেখতে পেলো লম্বুটা ওকে খুঁজে না পেয়ে সামনে থাকা একটা চেয়ারে লাথি মারলো রেগেমেগে। সঙ্গে থাকা দুই সঙ্গির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কী যেন বলল। কথাটা পুরোপুরি শুনতে না পারলেও এটা বুঝতে পারলো, ওকে খুঁজে বের করার নির্দেশই দিচ্ছে। একটু পরেই লোকগুলো বারান্দার শেষ মাথার একটা করিডোর ধরে অন্যদিকে চলে গেল।

"এখন বিশ্বাস হলো আমার কথা?" লোকটা ওর সাথে কথা বলতে বলতে বাইরে উঁকি দিলো। তুলি তাকিয়ে দেখলো লোকটার পরনে সাধারণ একটা জিন্স প্যান্ট আর শার্ট, শার্টের নিচে একটা টি-শার্ট। মাথায় কালো রঙের ক্যাপ।

"আপনি কে?" কালো ক্যাপ ওর মুখটা ছেড়ে দিতেই তুলি নিঃশ্বাস নিতে লাগলো জোরে জোরে।

লোকটা বাইরে একবার দেখে নিয়ে আবারো ওর একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো বাইরের দিকে। তুলি এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবারো বলে উঠলো, "কে আপনি? আপনার সাথে আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

কালো ক্যাপ কিছুই বলল না। একবার বারান্দার দু-পাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চট করে পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে মেসেজের সেন্ট-বক্সে একটু আগে তুলিকে পাঠানো মেসেজগুলো দেখালো। "আপাতত এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না। আসলে আসুন, না-হলে মরুন। আমি আপনার জন্যে মরতে পারবো না," বলেই পেছনদিকে বেরুবার গেট

যেদিকে তার উল্টেদিকে হাটতে লাগলো সে।

"আপনি ওদিকে যাচ্ছেন কেন?" তুলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। "বের হবার গেট তো অন্যদিকে।"

কালো ক্যাপ আবারো কিছু না বলে ওর দিকে তাকিয়ে বারান্দার মোটা কাঁচের দেয়ালের দিকে এগোতে ইশারা করলো। তুলি ওদিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা বাইরের ড্রাইভওয়েতে একটা নির্দিষ্ট স্থান দেখালো। তুলি প্রথমবার তাকিয়ে পরিস্কার কিছুই দেখতে পেলো না। তবে খেয়াল করার পর দেখতে পেলো। কালো ক্যাপ যেদিকে দেখাচ্ছে ঠিক সেখানে একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওকে যারা খুঁজছে সেই একই দলের লোক, কোন সন্দেহই নেই। এই ব্যাটাও জ্যাকেট পরে আছে গরমের ভেতরে।

"শুধু এখানেই না। সামনের মেইনগেট, হাসপাতালের সবগুলো এন্ট্রি আর এক্সিট পয়েন্টেই লোক আছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন," কালো ক্যাপ ওর দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে গলা কাটার ভঙ্গি করলো।

"তাহলে বের হবো কোন দিক দিয়ে?" নিজেকে খুব অসহায় লাগছে তুলির। এই লোকটা টেক্সট না পাঠালে হয়তো এতোক্ষণে ওই লম্বুর দলের হাতে ধরা পড়ে মারাও যেতে পারতো। "আর এরাই বা কারা? এরা আমাকে মারতে চাইছে কেন?" বলল সে। "আপনিই বা কে?"

কালো ক্যাপ ওকে রেখে অনেকটা এগিয়ে গেছিলো, ওর অসহায় ভঙ্গি দেখে আবার ফিরে এলো। "আমি সব বলবো, কিন্তু এই মুহূর্তে–" লোকটা কথা শেষ করার আগেই বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। তুলি চট করে ঘুরেই দেখতে পেলো সেই তিনজনের একজন বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে অন্যদেরকে ডাকতে শুরু করেছে লোকটা।

সাথে সাথে তুলির এক হাত চেপে ধরলো কালো ক্যাপ। "সময় নেই," বলেই একটানে তাকে ধরে দৌড় দিলো বারান্দার অপর দিকে। তুলিও প্রাণপনে দৌড়াতে লাগলো। ব্যাপার কি? হাসপাতালের সিকিউরিটির হলো কি? এভাবে একদল লোক হাসপাতালে ঢুকে যা খুশি তাই করছে কেউ কিছুই বলতে পারছে না। তাহলে এতোবড় প্রতিষ্ঠানে মানুষের নিরাপত্তা থাকলো কোথায়? দৌড়াতে দৌড়াতেই এসব ভাবতে লাগলো।

"সিকিউরিটি...আমাদের সিকিউরিটিকে কল করা উচিত," তুলি বলল।

একবার পেছন ফিরে দেখলো লোকগুলো এখনো আসছে, তবে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

ওর কথা শুনে কালো ক্যাপ হেসে ফেললো। "এরা সিকিউরিটির বাপ। জান বাঁচাতে হলে পালাতে হবে আপনাকে।"

ওরা প্রায় সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে গেছে এমন সময় কালো ক্যাপ ওর হাত টেনে ধরে সামনের দিকে বাঁক নিলো। এদিকেই সিঁড়ি ঘর। ওখানে পৌছে লোকটা ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমাকে ফলো করুন।"

তুলি দেখলো সরু সিঁড়িতে পাশাপাশি দু-জন দৌড়ানো বেশ কঠিন হবে ব'লে লোকটা ওর হাত ছেড়ে দিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি দৌড়ে উঠে যাচ্ছে এখন। তুলি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগলো। উত্তেজনা আর দৌড়াদৌড়ির কারনে হাঁপিয়ে উঠেছে। একবার পেছনে ফিরে দেখলো লোকগুলো আসছে কিনা। এখান থেকে দেখা না গেলেও অনুমান করলো ওরা অবশ্যই আসছে। সিঁড়ি ধরে উঠতে আরম্ভ করলো এবার। উঠতে শুরু করতেই দেখতে পেলো কালো ক্যাপ ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে।

"কি ব্যাপার, আবার–" তুলি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কালো ক্যাপ এক ঝটকায় ওকে টেনে নিয়ে চলে এলো সিঁড়ির গোড়ায়। সে কিছু বলার আগেই এক হাতে চেপে ধরলো ওর মুখ, ঠিক আগের মত।

ফিসফিস করে বলল লোকটা, "বিপদ।"

তুলি কিছু বলতে গিয়েও বলল না। সিঁড়ির ওপর থেকে হালকা পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কেউ নেমে আসছে নিচে। দু-জনেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জায়গাটা খুব একটা অন্ধকার নয়, আর আড়ালটাও বেশি সুবিধার না। ডানদিকে ভালো করে তাকালেই ওদেরকে দেখতে পাবে। তুলি খুব সাবধানে ওর সাথে থাকা লোকটার হাত এড়িয়ে সিঁড়ির গোড়ার দিকে তাকালো।

প্রথমেই চোখে পড়লো একটা পিস্তলের নল। নল এতো বড় হয় নাকি? ভাবনাটা মাথায় আসতেই বুঝতে পারলো লোকটার পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে। বহুবার অসংখ্য মুভিতে দেখা জিনিসটা চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলওয়ালার পরনে জিন্স প্যান্ট আর চেক শার্ট। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো সে। একহাতে

পিস্তল নিয়ে অপর হাতে মোবাইলফোন কানে চেপে কথা বলতে বলতে চলে গেল ওদের সামনে দিয়ে, এদিকে ফিরেও তাকালো না, তাই তার চেহারাও দেখা গেল না। চেক শার্ট পরা লোকটা খোলা বারান্দার দিকে চলে যেতেই কালো ক্যাপ ওর একটা হাত ধরে টান দিলো। "জলদি চলুন।"

তুলি লোকটার সাথে সিঁড়ি ধরে এগোতে এগোতে জানতে চাইলো, "কে এই লোকটা? এর হাতেও দেখি পিস্তল? ব্যাপার কি, সবাই এভাবে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? আর হাসপাতালের সিকিউরিটিই বা কোথায় গেল?"

"আমি আপনাকে বলেছিলাম না, এরা সিকিউরিটির বাপ।"

"কিন্তু এই চেক শার্ট লোকটা কে?"

"কে জানে! আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখি ওপর থেকে নেমে আসছে, হাতে পিস্তল...নিশ্চই ওই মোটকুর লোকই হবে। এখন কথা না বলে..."

কালো ক্যাপ কথা শেষ করার আগেই নিচ থেকে ভেসে এলো কারো উন্মাদের মতো চিৎকারের আওয়াজ, সেই সাথে তীক্ষ্ণ শব্দে কিছু একটা ভেঙে পড়লো, ধাম ধাম করে গুলি হলো কয়েকটা। দু-জনেই ঝট করে নিচের দিকে ফিরে তাকালো। প্রায় সাথে সাথেই তুলির হাত ধরে টান দিলো কালো ক্যাপ। "জলদি...জলদি!"

ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় চলে এলো। দোতলায় উঠে দৌড়াতে দৌড়াতে পার হয়ে এলো একের পর এক করিডোর। কালো ক্যাপ চিৎকার করে জানতে চাইলো , "ফায়ার-এস্কেপের সিঁড়ি কোন দিকে?"

"আমার সাথে আসুন," তুলি তার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো। "এদিকে।"

তাকে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে সেই টেরেসের সামনে চলে এলো তুলি। এটার পাশ দিয়ে একটা ফায়ার-এস্কেপের সিঁড়ি আছে। ওটা নিচে নেমে গেছে হাসপাতালের একপাশ দিয়ে। যদিও তুলি এখানে কাজ শুরু করার পর এখন পর্যন্ত এটা ব্যবহার করেনি।

"এখানে কোনদিকে?" অসহায়ভাবে জানতে চাইলো কালো ক্যাপ।

তুলি টানা দৌড়ে আসায় এখনো হাঁপাচ্ছে। হাত তুলে তাকে ইশারায় একপাশের একটা দরজা দেখিয়ে দিলো। লোকটা দরজার সামনে গিয়ে

একটু পরীক্ষা করে আফসোসের সাথে চিৎকার করে উঠলো, "শিট।"

"কি...কি ব্যাপার?" তুলি এখনো হাঁপাচ্ছে।

"দরজায় তো তালা," কালো ক্যাপের গলায় আর্তনাদের সুর।

"কি? ইর্মাজেন্সি দরজায় তালা!" অবাক হয়ে এগিয়ে এলো তুলি। মনে মনে ভাবলো, এটা একমাত্র এই দেশেই সম্ভব। "ধ্যাত্! এখন কি করা?" ও নিজেও একইরকম অসহায় বোধ করছে। হাসপাতালের সামনে-পেছনে দু-দিকেই লোকজন পাহারা দিচ্ছে। একাধিক গ্রুপ ভেতরে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওদেরকে। বের হবার একমাত্র উপায় ছিলো ফায়ার-এস্কেপের সিঁড়ি ব্যবহার করে নিচে নামা, এখন সেটারও দরজা বন্ধ। "বের হবার তো এই একটা পথই আছে।"

"হাসপাতালের আর কোন দিকে এরকম ইমার্জেন্সি দরজা আছে?"

"আমি...আমি জানি না," তুলি মনে করার চেষ্টা করছে। "মনে হয় দোতলা থেকে প্রতি ফ্লোরেই আছে। কিন্তু থাকলেও বা লাভ কি? আমরা কি ওখানে পৌছাতে পারবো?"

"হুমম...সেটাও সম্ভব হবে না।"

"আচ্ছা, ব্যাপার কি? এরা আমার পেছনে লেগেছে কেন?"

"দেবো, সব উত্তরই দেবো," কালো ক্যাপ তুলির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। প্রথমবারের মতো সে খেয়াল করলো, আগন্তুকের চোখদুটো একদমই পিঙ্গল বর্ণের। বাঙালিদের মাঝে এরকম চোখ খুব কমই দেখা যায়। কালো ক্যাপ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেল ওর পেছনে। সাথে সাথে সে বলে উঠলো, "দারুন।" ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল তুলির পেছন দিকে।

তুলি ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো লোকটা ওর পেছনের দেয়ালে ঝোলানো একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সিলিন্ডার নামিয়ে আনছে। "এটা দিয়ে কী হবে?" প্রশ্নটা করার সাথে সাথেই সে উত্তর পেয়ে গেল। লোকটা দু-হাতে সিলিন্ডারটা শক্ত করে ধরে ইমার্জেন্সি দরজায় লাগানো তালার ওপরে নামিয়ে আনলো পূর্ণ শক্তিতে।

খটাং করে তীব্র শব্দ হলো। কালো ক্যাপ আবারো তালার ওপরে আঘাত করলো সিলিন্ডার দিয়ে। আরো একবার।

তুলি মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কালো ক্যাপ

তালাটা ভাঙতে পারবে কিনা। তালাটা ছোট হলেও একদম নতুন আর বেশ মজবুত। আগন্তুক আপ্রাণ চেষ্টা করছে তালা ভাঙার। একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে সিলিন্ডার দিয়ে। তুলির মনে হচ্ছে সময় লাগলেও তালাটা ভেঙে ফেলতে পারবে কিন্তু ভয় পাচ্ছে, ওটা ভাঙতে গিয়ে কালো ক্যাপ যতোটা সময় নিচ্ছে আর যে-পরিমাণ শব্দ হচ্ছে তাতে ওই অস্ত্রধারি লোকগুলো ওদের অবস্থান টের না পেয়ে যায়।

তুলি একবার এদিকে দেখছে আরেকবার ডানে তাকাচ্ছে। অস্থিরতার সাথে জানতে চাইলো সে, "খোলা যাবে?"

"আর একটু," লোকটা তালায় আঘাত করতে করতেই বলতে লাগলো। "আর...একটু–" আরেকবার আঘাত করার জন্যে সে সিলিন্ডারটা তুললো কিন্তু সেটাকে তালার ওপরে নামিয়ে আনার আগেই ধাম করে একটা শব্দ হলো আর সেই সাথে ছিটকে গেল তালাটা। তুলি ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো ওই লম্বু গ্রুপের একজন করিডোরের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে একহাতে গুলি করছে অন্য হাতে মোবাইলে কথা বলতে বলতে ছুটে আসছে এদিকে। আবারো গুলির শব্দ হবার সাথে সাথে ছিটকে খুলে গেল স্টিলের দরজাটা।

কালো ক্যাপ তৎক্ষণাত দারুন বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ করলো। সে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সিলিন্ডারটা সোজা করে ওদের চারপাশে একরাশ গ্যাস স্প্রে করে দিলো। সাথে সাথে গুলি করতে করতে ছুটে আসা লোকটা আর ওদের মাঝে কুয়াশার মতো একটা আড়াল তৈরি হয়ে গেল। এই সুযোগে সে তুলির হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো দরজাটার অন্যপাশে। এতোক্ষণ যে-দরজাটা ওরা খোলার চেষ্টা করছিলো, ওই লোকটার গুলিতেই তালা ভেঙে খুলে গেছে ওটা।

কালো ক্যাপ তুলিকে নিয়ে ফায়ার-এস্কেপের সিঁড়িতে চলে এলো। দ্রুতবেগে নামতে লাগলো চিকন প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে।

তিন-তলা থেকে নিচে নামতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। ওরা প্রায় মাঝামাঝি নেমে এসেছে, এমন সময় ওপর থেকে লম্বুর দলের লোকটা গুলি করলো। টং করে গুলিটা লোহার সিঁড়িতে লেগে এদিক-ওদিক ছিটকে গেল। কালো ক্যাপ সাথে সাথে একহাতে তুলিকে আড়াল করে ধরলো, ওপর হাতে সে বের করে আনলো একটা পিস্তল। ঠিকমতো না দেখেই গুলি

করলো উপরের দিকে। পর পর দু-বার গুলি করে উপরের দিকে দেখে নিয়ে নামতে লাগলো নিচে।

ওরা প্রায় নিচে চলে এসেছে। আর এক কি দুই সিঁড়ি বাকি, এমন সময় খটাং করে আবারো গুলি এসে লাগলো লোহার সিঁড়িতে। তুলি অবাক হয়ে দেখলো এবার গুলি এসেছে নিচের দিক থেকে। একটু তাকাতেই দেখতে পেলো নিচ থেকে একজন গুলি করছে। ও অনুমান করলো নিচে দাঁড়ানো এই লোকটাও সেই লম্বুর দলেরই কেউ হবে। এ সম্ভবত বাইরে কোথাও পাহারায় ছিলো।

নিচ থেকে গুলি আসছে, ওপর থেকেও। ওরা ফাঁদের মধ্যে আটকে গেল। এতোক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র লোহার সিঁড়ির কারণে বেঁচে যাচ্ছে। কিন্তু যেকোন সময় একটা দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তুলি অনুভব করতে পারছে ওর সাথের লোকটাও অস্থির হয়ে উঠেছে। দু-জনের কেউই বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। নিচের পার্কিং থেকে এখন ওরা ঠিক এক সিঁড়ি ওপরে। এমন সময় নিচ থেকে ওদেরকে গুলি করতে থাকা লোকটা একেবারে এস্কেপ সিঁড়ির কাছাকাছি চলে এলো। সে বত্রিশটা দাঁত বের করে পিস্তল তুলে নিশানা করলো ওদের দিকে। এতো কাছ থেকে গুলি মিস করার কোনই কারণ নেই। মরিয়া হয়ে কালো ক্যাপ চিৎকার করে উঠলো, সেই সাথে এস্কেপ সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে সোজা নিচের দিকে লাফ দিয়ে লোকটার একেবারে গায়ের ওপরে গিয়ে পড়লো।

তুলি আতঙ্কের সাথে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। একটু হুটোপুটি করে যখন উঠে দাঁড়ালো তুলি দেখলো কালো ক্যাপ ওর দিকে তাকিয়ে নিচে লাফ দেয়ার ইশারা করছে আর গুলি করতে থাকা লোকটা অনড় পড়ে আছে মাটিতে। তুলি ইতিমধ্যেই নিচে নেমে এসেছে।

সিঁড়ির নিচে স্থির দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলো দুদিক থেকে দুই গ্রুপ ছুটে আসছে ওদের দিকে। একদিকে লম্বু আর তার সহকারি। অন্যদিকে চেক শার্ট। ও খুবই অবাক হয়ে খেয়াল করলো চেক শার্ট ওদের দিকে না বরং লম্বুর দিকে পিস্তল তুললো। এই সুযোগে কালো ক্যাপ ওর হাত ধরে টান দিলো। দু-জনেই উঠে দাঁড়িয়ে দিলো দৌড়।

"আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?" তুলি দৌড়াতে দৌড়াতেই জানতে চাইলো।

"দেয়ালের বাইরেই আমার গাড়ি দাঁড় করানো আছে," লোকটা জবাব দিলো।

তুলি একবার বলতে চাইলো ওর স্কুটির কথা, বাতিল করে দিলো সঙ্গে-সঙ্গে।

ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলো একপাশের বাগানের কাছের দেয়ালে। দেয়ালটা বেশি উঁচু নয়।

"আমি আপনাকে উঁচু করে ধরবো, আপনি উঠে যাবেন, পারবেন না?" লোকটা জানতে চাইলো। তুলি একবার দেয়ালটা দেখে নিয়েই হ্যা বলে দিলো। সাথে সাথে আগন্তুক ওর কোমর ধরে ওকে তুলে দিলো দেয়ালের ওপরে। ওখান থেকে তুলি লাফিয়ে নেমে পড়লো অপর দিকে। একটু পরেই আগন্তুকও নেমে এলো দেয়ালের এপাশে।

"গাড়ি কোথায়?"

"ওই যে," রাস্তার ওপর পাশে দেখালো সে।

ওরা রাস্তা পার হতে হতে তুলি আড়চোখে দেখলো অন্যপাশের গেট দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে আসছে কেউ একজন। ওরা এক দৌড়ে চলে এলো গাড়ির কাছে। তুলি দেখলো একটা কোরোলা গাড়ি। সেই গাড়িতে উঠে বসলো ওরা দু-জন। প্রায় সাথে সাথেই আগন্তুক স্টার্ট দিয়ে ফেললো গাড়িটা। একটানে হুইল ঘুরিয়ে ওটাকে তুলে ফেললো রাস্তার ওপরে। মাথা ঘুরিয়ে ও দেখলো ওদের গাড়ির পেছন পেছন দৌড়ে আসছে চেক শার্ট. মোটকুর দলের কাউকে দেখতে পেলো না ও। চেক-শার্ট প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে ওদের গাড়ির পেছনে আসছে কিন্তু আরেকটু এগোতেই আগন্তুক গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। ওদের পেছনে থেমে গেল চেক শার্ট। আগন্তুক মূল রাস্তায় উঠেই ফুল-স্পিড দিয়ে দিলো গাড়িতে।

"উফ্, বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি," তুলি স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নেতিয়ে পড়েলো সিটের ওপরে। এবার আপনি আমাকে বলুন, হচ্ছেটা কি এখানে? আপনি আমাকে এভাবে বাঁচালেনই বা কেন?"

আগন্তুক গাড়ি চালাতে চালাতে হেসে ফেললো। "ধীরে ম্যাডাম, ধীরে। আগে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে থ্যাঙ্কস তো দেবেন। পরে না-হয় সব বলছি।"

তুলি বড় করে দম নিলো। "প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সত্যিই থ্যাঙ্কস।

কিন্তু আমাকে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। আগে আমাকে বলুন এরা কারা? এরা কেন আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে? আর আপনি সেটা জানলেন কিভাবে? আপনি আমাকে বাঁচাতে গেলেন কেন? সবচেয় বড় প্রশ্ন, আপনি কে?"

"ম্যাডাম, অস্থির হবেন না। আমরা বিপদ কাটিয়ে উঠেছি। সব বলবো আপনাকে, তার আগে আমি নিজের পরিচয়টা দিয়ে নেই। আমি ডিবি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার আরিফ...আরিফুর রহমান," বলে সে তার কটা রঙের চোখের দৃষ্টি স্থির করলো তুলির চোখে।

খুনি

লাইফ-লাইন হাসপাতালের সামনে
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
রাত–১০:৩০

তীব্র রাগের সাথে একবার ঘড়ি দেখে সে ফিরে তাকালো তার পাশে বসে থাকা টাক মাথার ছোট-খাট মানুষটার দিকে। সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "এই মিয়া, বুঝেশুনে কথা বলবেন। কার সাথে কথা বলছেন সেটা আগে বিবেচনা করে তারপর কথা বলবেন। আমি আপনাদের মতো বেতন-ভুক্ত চাকর নই। কারো চামচাও নই। কাজেই সাবধান। মুখ খুলবেন সাবধানে, না হলে ওটা চিরতরে বন্ধ করে দিতে এক মুহূর্তও লাগবে না আমার।"

সামনে বসে থাকা ভাড়াটে খুনি বিলাই আফসারের দিকে তাকিয়ে না চাইতেও ভয়ে একবার ঢোক গিলে ফেললো ছোট-খাট মানুষটা। "আমি...আমি কি বললাম। আপনার কারণেই তো..."

"চুপ, একদম চুপ! আবার কথা বলে?" আফসার গর্জে উঠলো। "এই ব্যাটা, তোরা আমারে প্রথমে কি বলছিলি?" সামনে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবার তার পাশে বসা মানুষটার দিকে তাকালো সে। "কথা বলিস না ক্যান? কি বলছিলি প্রথমে?"

"আ-আমি তো..."

"চোপ! তুই না হোক, তোর বস তো বলেছিলো। প্রথমে তোরা আমারে টাকা দিছিলি লোকটারে খুন করার জন্যে। ঠিক শেষ মুহূর্তে, একেবারে শেষ মুহূর্তে তোরা আমারে বললি খুন না করে লোকটাকে অপহরণ করতে হবে। ঠিক আছে, তা-ও মেনে নিলাম। লোকটা কে? কি তার পরিচয়? কেন তাকে দরকার? তার সাঙ্গ-পাঙ্গ কারা, এসব কিছুই আমাকে জানালি না। এমনকি এটাও জানানোর প্রয়োজন বোধ করলি না, এই লোক কুখ্যাত ডন জাফর সাদেকের ডানহাত, তার পেছনে পুলিশ

থেকে শুরু করে একশ একটা লোক লেগে আছে। বল্ আমাকে, জানাইছিলি? কথা কস না ক্যান এখন?"

"আমি কি করবো? বসই তো..." পেশাদার খুনির কথার তোড়ে টাক মাথা একদম কুঁকড়ে গেল।

"আবার বসের কথা বলে? ওই ব্যাটা তোর বস হতে পারে আমার না। তুই আর তোর বস মিলে আমারে মারার ব্যবস্থা করছিলি, তাই না?" বলে সে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে টাক মাথার দিকে ঘুরে তাকালো।

"আ-আমরা তা করতে যাবো কেন? আপনার ক্ষতি করে আমাদের কি লাভ? বরং আপনাকে দিয়ে আমাদের কতো কাজ হয় সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, উল্টো এই ঝামলো থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবে না। যা হয়েছে ভুলে হয়ে গেছে।"

আফসারের দৃষ্টি একটু শান্ত হয়ে এলো। বড় করে দম নিয়ে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা রাগটাকে সামলে নিলো খানিকটা। তার সামনে বসে থাকা লোকটার আসলে কোনই দোষ নেই, এ লোকটা স্রেফ আদেশ পালন করছে মাত্র। সে খুনি হতে পারে কিন্তু যুক্তিহীন নির্বোধ নয়। আর এটাই তার স্বকীয়তা, এ স্বকীয়তা দিয়েই সে চট্টগ্রাম এলাকায় অল্প বয়সেই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। "ঠিক আছে, এখন কি করতে হবে? ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এখন তোমার বসকে ফোন করে জিজ্ঞেস করো এরপর কী করতে হবে। আর উনি নতুন যে-নির্দেশনাই দেন না কেন আগের চেয়ে তিনগুন বেশি টাকা লাগবে। ঠিক তিনগুন।"

টাক-মাথা তার সামনে বসে থাকা খুনির পিঙ্গল রঙের চোখের দিকে তাকালো। তাদের এলাকায় এ-ধরণের চোখকে বলা হয় বিলাই চোখ। চোখের এই রঙের কারনেই এ-খুনির ডাক নাম বিলাই আফসার। সে খুনির দিকে তাকিয়ে বুঝলো এর কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করা হলে তার তো বটেই, তার বসেরও খবর আছে। "জি, আচ্ছা," বলে সে খুনির তীব্র দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে চটজলদি মোবাইলফোনটা বের করে ডায়াল করতে শুরু করে দিলো।

তার সামনে বসে থাকা লোকটা মোবাইল বের করে ডায়াল শুরু করা মাত্রই আফসার তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সামনে তাকালো। এ-শহর তার শহর। এ-শহরের এক বস্তিতে জন্ম তার, জন্মের সময়েই মা মারা

যায়। নিজের বাবার পরিচয় সে কোনোদিনই জানতে পারেনি। ওর জন্মের সাথে সাথেই মা'র মৃতদেহ আর বাবার পরিচয় দুটোই চলে যায় কবরে। যেদিন থেকে ওর জন্ম সেদিন থেকেই ওর সংগ্রাম শুরু। একেবারে শিশু অবস্থায় সে প্রতিপালিত হতে থাকে পাশের বাড়ির এক খালার কাছে। একটু বড় হতেই ওকে দিয়ে দেয়া হয় এক এতিমখানায়। সেখানে পড়ালেখার চেয়ে মার হজম করতে হতো বেশি। তবুও হার মানেনি সে। মাদ্রাসায় পড়ালেখা শেষ করে সেখান থেকে অনেক কষ্ট করে ভর্তি হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর জীবনটাকে নিয়ে ও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

নিজের বিতিকিচ্ছিরি, কর্দমাক্ত আর অসহায় জীবনটাকে ধীরে ধীরে সাজানোর পরিকল্পনা করতে থাকে। চুপচাপ পড়ালেখা নিয়ে থাকতো, কোন ঝামেলা দেখলে একশ হাত দূর দিয়ে হাটতো। ওর উদ্দেশ্য ছিলো বিসিএস দিয়ে একদিন পুলিশ হবে। সে-অনুযায়ি প্রস্তুতিও নিচ্ছিলো। তারপর একদিন ভার্সিটির হলে এক নেতার সাথে গন্ডগোল লাগে ওর। ব্যাপারটা ও মিটিয়ে ফেলতো কিন্তু ঝামেলা হয় সেই নেতা ওকে সিট থেক উৎখাত করে নিজের লোক তুলতে চাইছিলো। কিন্তু ওর পক্ষে সেটা মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না, কারণ ভার্সিটির হলের ওই সিট ছিলো ওর পৃথিবী। যাবার মতো ওর আর কোন জায়গাও ছিলো না। এ-ব্যাপারটাই সে নেতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, খুব স্বাভাবিকভাবেই নেতা সেটা তো বোঝেন না-ই, উল্টো ওকে মারতে আসেন।

সেদিনটা আর দশ দিনের মতো ছিলো না। নিজের ভবিষ্যত এবং থাকার জায়গা নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলো সে। কিন্তু সেদিনই যে তার ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে যাবে, কে জানতো। সেই নেতা তার দলবল নিয়ে ওকে মারতে আসে। কিন্তু মারামারির এক পর্যায়ে ওদেরই একজনের একটা রড চলে আসে ওর হাতে। রডটা হাতে আসা মাত্রই মরিয়া আফসার নিজের ভেতরে সেদিন অন্য এক মানুষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে–ভয়ঙ্কর হিংস্র এক মানুষ। ওই রড দিয়ে পিটিয়েই সে একজনকে মেরে ফেলে, অন্য দু-জনকে করে আধ-মরা। এরপর পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু এক গডফাদার তাকে বের করে নিয়ে আসে, নিজের বাহিনীতে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয় ওকে। ততোদিনে আফসার বুঝে গেছে পুরনো জীবনে ফিরে যাবার কোনো

উপায় নেই, বাঁচতে চাইলে ওকে এই লাইনেই থাকতে হবে। সে পুরোদস্তুর ক্যাডার বনে যায়। ক্যাডার বললে ভুল হবে, খুনি। গডফাদারের ক্যাডার বাহিনীতে কাজ করার সময় সে বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে, খুন করার ব্যাপারে ওর প্রতিভা অন্যরকম। সেইসাথে ছোটবেলা থেকে ধাক্কা-গুতো খেতে খেতে ওর ভেতরে ভয়-ডর আর দ্বিধা বলে কোন বস্তু নেই। দীর্ঘদিন ওই গডফাদারের বাহিনীতে কাজ করতে করতে এক পর্যায়ে সে নিজেরই গ্যাঙ খুলে খুনের ব্যবসা শুরু করে দেয়। এখন সে প্রচুর টাকার বিনিময়ে শুধুমাত্র সিলেক্টেড ব্যবসায়িদের হয়ে কাজ করে ।

দক্ষ হবার কারণে কাজেরও কোন অভাব হয় না ওর। বেশিরভাগ সময়ে ওর দলের লোকজন কাজ করে; ও শুধু পরিচালনা করে। কিন্তু বিশেষ কাজ এবং বিশেষ ক্লায়েন্টদের কাজ ও নিজে করে। এই কাজটার প্রস্তাব আসে গতকাল, এক থার্ড পার্টির মাধ্যমে। এই থার্ড পার্টি আবার ওর নিয়মিত ক্লায়েন্টদের একজন। কাজটা শুরুতে খুব সহজই ছিলো। এক লোককে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মেরে রেখে আসতে হবে। ওর বাহিনীর সবচেয়ে পুচকে ছেলেটাও পারবে। কিন্তু ওকে প্রস্তাব দেয়া হয় কাজটা যেন ও নিজে করে। ও প্রথমে রাজি হয়নি কিন্তু টাকার অঙ্ক শুনে রাজি হয়ে যায়। অবশ্য মনের ভেতের খুঁতখুঁতানি একটা ছিলো। কারণ এতো সহজ কাজে এতো টাকা দেয়ার কথা নয়। তবুও সহজ কাজ হবার কারণে সে কাজটা নিয়ে নেয়।

কথা ছিলো নির্দিষ্ট একটা সময়ে আগ্রাবাদের লাইফ-লাইন হাসপাতালের পেছনে এই লোক একজনের সাথে দেখা করতে আসবে, সেখানেই তাকে মারতে হবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওর ক্লায়েন্ট নির্দেশ পরিবর্তন করে জানায়, লোকটাকে মারা চলবে না, ধরে আনতে হবে। ও নিজের পরিকল্পনা একটু পরিবর্তন করে ওই জায়গায় গিয়ে আগে থেকেই পজিশন নিয়ে ছিলো। লোকটাকে দূর থেকে ও দেখতেও পায়। তারপর পেছন থেকে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ঠিক যখন লোকটাকে ধরতে যাবে হঠাৎ লোকটা ঘুরে দাঁড়ায় পিস্তল হাতে। কিন্তু গুলি করে না। কারন দু-জনেই দু-জনকে দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলো।

আফসারের চমকে ওঠার কারন ছিলো–এই লোকই বহুবছর আগে পুলিশের হাজত থেকে ছাড়িয়ে ওকে জাফর সাদেকের গ্যাঙে যোগ দেয়ার

প্রস্তাব দিয়েছিলো। এই লোক এক সময়ে ছিলো ওর বাবার মতো, এরপর যখন আফসার নিজের গ্যাঙ খোলে তখন এই মানুষটাই পরিণত হয় ওর জানের শত্রুতে। এ-সেই মানুষ। এই মানুষটাকেই ধরতে এসেছে আগে জানতে পারলে সে আসতোই না। লোকটাকে দেখামাত্রই ওর মনের ভেতরে স্মৃতিগুলো ভেসে উঠতে থাকে। হয়তো ওই মানুষটারও মনে একই কথা ভাসছিলো।

কিন্তু ওই লোকটাই ওর আগে সম্বিত ফিরে পেয়ে সোজা গুলি করে ওকে। ও লাফিয়ে পড়ে একপাশে, এরপর যখন পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়িয়ে গুলি করতে শুরু করে ততোক্ষণে লোকটা পেছন ফিরে দৌড়াতে শুরু করে দেয়। মানুষটাকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছেই ওর ছিলো না কিন্তু নিজেকে সামলানোর আগেই তিনটে গুলি বেরিয়ে যায় পিস্তল থেকে। তিনটেই ঘায়েল করে লোকটাকে। কিন্তু অসম্ভব প্রাণশক্তির জোরে লোকটা দৌড়ে ঢুকে পড়ে হাসপাতালের ভেতরে। আর ও ফিরে আসে গাড়িতে।

একদিন সে হতে চেয়েছিলো পুলিশ, কপালের ফেরে আজ হয়ে গেছে খুনি। যে মানুষটাকে একদিন নিজের বাবার স্থান দিয়েছিল সে-মানুষটাকেও আজ গুলি খেতে হলো ওর হাতে।

"ভাই," হঠাৎ করে ওর সামনে বসে থাকা টাক মাথা লোকটার ডাকে পুরনো স্মৃতি থেকে ফিরে এলো বাস্তবে। "ভাই।"

"হ্যা, বলো।"

"ভাই, ঘটনা প্যাঁচ খেয়ে গেছে।"

"কি?"

"ওই লোকটা তো মারা গেছে," টাক মাথা তার টাকে হাত বুলাতে বুলাতে অসহায়ভাবে বলতে লাগলো।

"তুমি জানলে কিভাবে?"

"আমি কোত্থেকে জানবো! বস জানালো। হাসপাতালের ভেতরে বসের লোক আছে, তারা জানিয়েছে।"

"ভালোই তো, ঝামেলা মিটে গেল। আমাকে আমার টাকা বুঝায়ে দেও, আমি বিদাই হই। আমার কাজ শেষ," আফসার চিন্তিত মুখে বলল, মানুষটাকে মেরে ফেলায় ওর মনের কোণে কি একটা সূক্ষ্ম ব্যথা চিলিক দিয়ে উঠছে? নাকি হঠাৎ উদ্ভুত এই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে ফায়দা লোটা

যায় সেটা ভেবে ওর মাথা ভারি লাগছে, বুঝতে পারলো না।

"না, ভাই," আপনার কাজ আরো বেড়েছে।

"সেটা কিভাবে?" কথোপকথনটা কোন দিকে যাচ্ছে আফসার বোঝার চেষ্টা করছে।

"ওই লোকটা মারা যাবার আগে একজনের সাথে কথা বলেছে।"

"ওই মিয়া, কি বকতাছো? ঠিকমতো কথা কও," লোকটার মিনমিনে কথা-বার্তা আফসারের মেজাজ খারপ হয়ে গেছে। "ওই লোক মরার আগে কথা কইছে তো তোমাদের কি?"

"ভাই, এখানেই তো সমস্যা। যে-কারণে ওই লোকটাকে ধরে আনার নির্দেশ দিয়েছিলো লোকটা মারা যাবার আগে সম্ভবত সেটা একজনকে জানিয়ে গেছে। মানে, বস ধারণা করছে আরকি। এখন সেই মানুষটাকে বসের দরকার।"

"মানে কি?"

"এই লোক মারা যাবার আগে তার সিক্রেট কাউকে জানিয়ে গেছে কিনা সেটা তোমার বস জানলো কিভাবে?"

"ভাই, এ-লোকটা মারা যাবার আগে শুধুমাত্র একজনের সাথেই কথা বলেছে, সে অবশ্যই মারা যাবার আগে ব্যাপারটা কারো না কারো সাথে শেয়ার করবেই। ব্যাপারটাই এমন যে, সে এটাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেবে না। আর যেহেতু সে মারা যাবার আগে শুধুমাত্র একজনের সাথেই কথা বলেছে কাজেই কথাটা ওই মানুষটাকে অবশ্যই জনিয়ে গেছে।"

"হুম...এখন তোমার বস আমার কাছে কি চায়?"

"উনি চান আপনি ওই মানুষটাকে ধরে আমাদের কাছে ডেলিভারি দিবেন। বিনিময়ে আপনাকে দশ লাখ টাকা দেবেন বলেছেন।"

টাকার অঙ্কটা শুনে আফসারের চোখ কপালে উঠে গেল। "পাগল নাকি তোমার বস?" একটু চিন্তা করলো। ব্যাপারটা কী নিয়ে, ওকে জানতে হবে। "ঠিক আছে, আমি এ-কাজ করবো কিন্তু তার আগে তোমার বসের সাথে আমি নিজে কথা বলবো।"

ওর প্রস্তাব শুনে টাক-মাথা লোকটা কথা না বলে মোবাইলে বিশেষ একটা নম্বর ডায়াল করে আফসারের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আফসার তার নিয়োগকর্তার সাথে টানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে কেটে

দিলো কলটা। ভেতরে ভেতরে একটু দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ও ঘুরে তাকালো সামনে বসে থাকা টাক-মাথার দিকে। "ঠিক আছে, আপনি এবার আসতে পারেন, আমি ব্যাপারটা দেখছি। এরপর থেকে আপনাকে আর আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে না। আমি সরাসরি আপনার বসের সাথে যোগাযোগ করবো।"

"আপনি কি এখন হাসপাতালের ভেতরে যাবেন?" আফসারের মনে হলো চলে যেতে বলায় লোকটা খুশিই হয়েছে।

"হুম, ওই লোকটা মারা যাবার আগে এক ডাক্তারের সাথে কথা বলেছে। তাকে খুঁজে বের করে হাপিস করতে হবে। তবে সমস্যা হলো এই একই মানুষের কাছে সম্ভবত পুলিশ এবং আপনার বসের অপজিট গ্যাঙের লোকজনও পৌছানোর চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই পৌছে গেছে কিনা কে জানে," আফসার আপনমনে কথা বলতে বলতেই গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে পিস্তলে গুলি ভরে নিলো। টাক-মাথা বিদায় নিতেই আফসার টি-শার্টের ওপরে একটা শার্ট চাপিয়ে মাথায় একটা কালো রঙের ক্যাপ পরে নিলো যাতে চেহারা একটু হলেও ঢাকা থাকে।

ওর মনের ভেতরে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কাজ করছে, এই ব্যাপারটার শেষ দেখতে হবে। কাজটা এখন আর প্রফেশনাল পর্যায়ে নেই, এর সাথে ব্যক্তিগত ইস্যু জড়িয়ে গেছে। গডফাদার জাফর সাদেকের হাত ধরেই ওর এই জগতে প্রবেশ, দু-জনেরই দু-জনার ব্যাপারে কিছু বিষয় অসমাপ্ত রয়ে গেছিলো, হয়তো এখন সময় এসেছে সেগুলো মিটমাট করার।

মনে মনে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ও মোবাইল বের করলো পকেট থেকে। আফসার সাধারণত কখনোই একা চলে না। তার একেবারে সাথে না হলেও আশেপাশে অবশ্যই নিজের দু-চারজন লোক থাকবেই। এখানেও আছে। তার এক সাগরেদ আশেপাশেই আছে। ওকেই ফোন করে জানিয়ে দিলো, ও হাসপাতালের ভেতরে ঢুকছে, হাসপাতালের ভেতরে যদি সন্দেহজনক কাউকে ঢুকতে দেখে তবে যেন সাথে সাথে ফোন করে ওকে জানায়। আফসার গাড়ি থেকে বেরিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাটতে লাগলো। ওর কানে হেডফোন লাগানো, একটা হাত পকেটের ভেতরে। সে হাসপাতালের কাছে এসে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের ফ্রন্ট-ভিউটা জরিপ করে নিলো। কোন ধরনের অস্থিরতা

কিংবা অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না। রাত বেশি হয়ে গেলেও হাসপাতালের ভেতরে লোক সমাগম একেবারে নেই তা নয়। হঠাৎ-হঠাৎ দুয়েকজন ঢুকছে-বেরুচ্ছে। মেইন গেটটা বড় করে খোলা।

আফসার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে এক প্যাকেট পাউরুটি কিনলো, সাথে দুই হালি কলা। হাসপাতালে এই জিনিস খুবই কমন। প্রায়ই রোগির সাথের লোকজন রোগির জন্যে কিংবা নিজেদের জন্যে পাউরুটি-কলা কিনে নিয়ে যায়। ওর এই জিনিস কেনার কারণ হলো, হাতে এই জিনিস থাকলে যে-কেউ ওকে খুব সহজেই হাসপাতালের রোগির লোক ব'লে ধরে নেবে। ও পাউরুটি আর কলার প্যাকটটা হাতে নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাটতে হাটতে মেইন গেট দিয়ে ঢুকে কেয়ারি করা বাগানটা পার হয়ে চলে এলো হাসপাতালের সদর দরজার সামনে।

ভেতরে ঢুকতেই একটা বড় রিসেপশন, তার একপাশে অনেকগুলো চেয়ার পাতা, ওগুলোর সামনে দেয়ালে একটা এলসিডি টিভি চলছে। চেয়ারগুলোতে এই মুহূর্তে একজনও ভিজিটর নেই। হাসপাতালেরই পোশাক পরা এক ওয়ার্ড-বয় বসে বসে ঢুলছে। টিভিটা খামোখাই চলছে, কেউ দেখছে না। রিসেপশনে বসা এক ছেলে মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। তার পড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কাল সকালেই এই পত্রিকার ওপরে তার পরীক্ষা নেয়া হবে। এই রাতের বেলা এতো মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ার মানে কি আফসার বুঝতে পারলো না।

সে এক ঝলক পরিস্থিতিটা দেখে নিয়ে চলে এলো টিভির ঠিক সামনে। এখানে বিশেষ একটা জিনিস খুঁজছে। এক হাত দিয়ে খামোখা চলতে থাকা টিভিটা বন্ধ করে দিলো। টিভি বন্ধ করার সময় চোখে পড়লো ওর কাঙ্খিত জিনিসটা। হাসপাতালের একটা ম্যাপ। একপাশের দেয়ালে ঝুলছে। ম্যাপে এক পলক চোখ বুলিয়ে দুটো জিনিসের অবস্থান ভালোভাবে দেখে নিলো। ইমার্জেন্সি এরিয়া আর সিকিউরিটি রুম। অবস্থান দুটো দেখে নিয়ে মোবাইল বের করে পুরো ম্যাপটার দুটো ছবি তুলে নিলো।

"রোগির লাইগ্গা রাইতের খাওন?" প্রশ্নটা শুনে আফসার চট করে পেছন ফিরলো। চেয়ারে বসা ওয়ার্ড বয় হাই তুলতে তুলতে গল্প করার ছলে প্রশ্ন করেছে ওকে।

"হুম, আর কিছু তো পেলাম না, এটাই খাওয়াতে হবে আর কি। বুড়ো

মানুষ আর কী খাবে," দ্রুত কথাগুলো বানিয়ে জবাব দিলো ও।

"দুদ আনেন নাই? দুদ আনলে তে বিজাই খাইতে পারতো?"

"মনে নাই," আফসার ওর দিকে এক পা এগিয়ে এলো। "আচ্ছা, ইমার্জেন্সিতে কি কোন ডাক্তার আছে?" হাতের ইশারায় নিজের পা দেখিয়ে জানতে চাইলো, "পায়ে ব্যথা পেয়েছি, ডাক্তার থাকলে একটু দেখাতাম।"

"এক ডাক্তার ম্যাডাম তো আছিলো, চইলাই গেল কিনা? তয় থাকলেও দেহাইতে পারতেন কিনা সন্দো আছে। একটু আগে এক রোগি মইরা গেছে, সবাই হেরে লইয়া ব্যস্ত।"

"হুম, ম্যাডাম কোথায় আছে বলতে পারবেন?"

"আমি কইবার পারি না। ওইনে গিয়া দেহেন," কথাগুলো বলে আবারো হাই তুলতে লাগলো সে।

হাই তুলতে থাকা ওয়ার্ড-বয়কে পেছনে রেখে আফসার দ্রুত পায়ে ইমার্জেন্সির দিকে এগোলো। প্লাজা এরিয়ার বেশ খানিকটা ঘুরে এসে চলে এলো ইমার্জেন্সিতে। অবাক করা বিষয়, এখানে সে কাউকেই দেখতে পেলো না। খুঁজে-খুঁজে কারো ছায়াও না পেয়ে সামনে এগোল। ব্যাপার কি? সবাই গেল কই? মনে মনে ভাবলো সে।

একটু এগোতেই দেখা পেলো দু-জন নার্সের। ভেবেছিলো ওদেরকে জিজ্ঞেস করবে ইমার্জেন্সির লোক সব কোথায় কিন্তু সেটা আর করতে হলো না, গল্প করতে থাকা নার্সদের কথা থেকেই বুঝতে পারলো ইমার্জেন্সিতে মারা যাওয়া রোগি এখন ওটিতে, সেখান থেকেই মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। সবাই সেখানেই আছে।

নার্স দু-জন চলে যেতেই আফসার তৎপর হয়ে উঠলো। প্রথমেই পাউরুটি আর কলার পলিথিন ব্যাগটা ফেলে দিলো একটা ওয়েস্ট-বিনে। এরপর দ্রুত পায়ে ঢুকে পড়লো ইমার্জেন্সিতে। এখানে ডিউটি ডাক্তারদের একটা লিস্ট টাঙানো আছে। এই মুহূর্তে ডিউটি ডাক্তারের নাম লেখা ডক্টর সাবিকুন্নাহার তুলি। পাশে নম্বরটাও দেয়া আছে। ও নম্বরটা মোবাইলে টুকে নিতেই বেশ কিছু গলার আওয়াজ পেয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো ইমার্জেন্সি থেকে। দেখলো হাসপাতালের পোশাক পরা বেশ কয়েকজন ইমার্জেন্সির দিকেই আসছে। ও চট করে একটা পিলারের আড়ালে সরে গেল। আফসার অনুমাণ করলো এরা ইমার্জেন্সি ডিউটিতে থাকা লোকজন। ডাক্তার তুলি

সম্ভবত এদের ভেতরেই কেউ একজন হবে আর সেটা কে বুঝতে তার একটুও বেগ পেতে হলো না। কারণ এই ক-জনের ভেতরে একজনই নারী, তার পরনে অপারেশন করার সময়ে ডাক্তাররা যে-ধরনের পোশাক পরে সেরকম পোশাক, মাথায় গোল ক্যাপ। বাকিদের সাথে কথা বলতে বলতেই সে ইমার্জেন্সি রুমের ভেতরে ঢুকে গেল।

এই পর্যায়ে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে গেল আফসার। মেয়েটা কি ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে, নাকি ওখানেই এখনো তার ডিউটি? ভেতরে তার সাথে এখন বেশ কিছু লোকজন আছে। ওখানে ঢুকে কিছু করা সম্ভব হবে না। ওর কাছে মনে হলো মেয়েটার বেরিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো কিংবা ইমার্জেন্সি খালি হলে পরে কিছু করতে হবে। ও মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে ফেললো কিভাবে কী করবে। যেভাবেই হোক মেয়েটাকে ওর একলা পেতে হবে। তারপর তাকে অজ্ঞান করে কোন একটা রানিং ট্রলিতে নিয়ে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে বাইরে নিয়ে যাবে। এরপর হয় কোন একটা অ্যাম্বুলেন্স দখল করবে নয়তো ওর কোন সাগরেদকে দিয়ে ওর গাড়িতে করেই...

ওর পরিকল্পনার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে মোবাইলফোনটা ভাইব্রেট করতে লাগলো। হেডফোনেই রিসিভ করলো কলটা।

"হ্যালো।"

"ভাই, সমস্যা," হাসপাতালের বাইরে পাহারারত স্যাঙ্গাতের গলা।

"বলো," আফসারের গলা একেবারে শান্ত।

"ভাই, হাসপাতালের পেছন দিকে একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়িয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে কিন্তু ওইটা থেকে কোন নড়াচড়া নাই–"

"এইটাই তোর সমস্যা?"

"না ভাই, সমস্যা অন্যখানে।"

"কি?"

"এইমাত্র একটা মাইক্রো আইসা থামছে ওই পিছন দিকেই। ওইটার ভিতরে কে জানো?" সে একটু বিরতি দিলো। "গন্ডার শামসু।"

"কি?" আফসার সত্যি সত্যি চমকে উঠলো। "গন্ডার শামসু একা...?"

"না ভাই, ওর পুরা দল নিয়া আসছে।"

"তুই কি শিওর, ওরা এই হাসপাতালেই আসছে?"

"আমি শিওর ভাই, ওরা পাঁচ-ছয়জন আসছে। এরইমধ্যে একজন হাসপাতালের সামনের গেইটে, একজনে পেছনের গেইটের ঠিক সামনেই খাড়াইয়া গেছে। আর শামসু মনে হয়..." এই পর্যন্ত বলে সে থেমে গেল। "ভাই, শামসু দুইজনরে নিয়া ভিতরে ঢুকতাছে। সাবধান।"

আফসার কলটা কেটে দিলো। পরিস্থিতি যা ভেবেছিলো তারচেয়ে বেশি খারাপ হয়ে গেছে। গন্ডার শামসু বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে বড় ডনদের একজন তালুকদার মোস্তাফিজের ডানহাত। বিশালদেশি লোকটা আকারে এবং কাজেকর্মে রীতিমতো একটা দানব। শামুস যেহেতু এখানে এসেছে তার মানে, এই মেয়ের পেছনে লেগেছে মোস্তাফিজ। আফসার মনে মনে হিসেব করে ফেললো। এই মেয়ের পেছনে লেগেছে সে আর তার নিয়োগকর্তা, সেইসাথে চট্টগ্রামের ডন মোস্তাফিজ এবং অবশ্যই পুলিশ। এদের সবার ভেতর থেকে একে ছিনিয়ে বের করতে হলে আগের পন্থায় কাজটা করা অসম্ভব। নতুন কিছু করতে হবে।

আফসার পরিকল্পনা পরিবর্তন করে নতুন পরিকল্পনা করে ফেললো। দ্রুত পায়ে রওনা দিলো সিকিউরিটি রুমের দিকে। ইমার্জেন্সি রুমের এক ফ্লোর ওপরেই সিকিউরিটি রুম। সেই রুমের সামনে এসে একবার দুপাশে তাকিয়ে আস্তে করে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

হালাকা পায়ে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিলো সে। প্রথমেই কানে এলো বাঘের গর্জন। গর্জন শুনে নিশ্চিত পায়ে ভেতরে ঢুকে লাগিয়ে দিলো দরজাটা। ঘরে দুই সারি মনিটরের সামনে একটা রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বাঘের গর্জনের মতো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে ইয়া মোটা এক লোক।

আফসার কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলের বাট থেকে হাত সরিয়ে নিলো। ও ভেবেছিলো সিকিউরিটি রুমে ডিউটিরত অফিসারকে এক ঘা দিয়ে অজ্ঞান করে নেবে কিন্তু বাঘের গর্জন শুনে মনে হচ্ছে না সেটার দরকার আছে। এ-ব্যাটা জেগে উঠলে পরে দেখা যাবে। প্রথমেই ইমার্জেন্সি রুমের সামনে আর হাসপাতালের মূল ভবনের বাইরের ক্যামেরার ভিউটা খুঁজে বের করলো। বাইরের ক্যামেরার দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো বিশালদেহি এক লোক, সবার মাথা ছাড়িয়ে তার মাথা উঠে গেছে ওপরের দিকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরো দু-জন। সে-দু-জনার দিকে তাকিয়ে লম্বু হাত-পা

নেড়ে-নেড়ে কী যেন বলছে। অন্যদিকে ইমার্জেন্সি রুমের বাইরে তাকাতেই দেখতে পেলো ডাক্তার তুলি বেরিয়ে আসছে বাইরে। আফসার শঙ্কিত হয়ে উঠলো, মেয়েটা যদি বাইরের দিকে রওনা দেয় তবে সোজা গিয়ে পড়বে বাঘের খপ্পরে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটা হাসপাতালের ভেতরের দিকে রওনা দিলো। একটু পরেই তাকে দেখতে পেলো দোতলার সিঁড়ি-ঘরে। ওখান থেকে ঘুরে সে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

মেয়েটা যাচ্ছে কোথায়? গেটের বাইরের ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দেখলো গন্ডার শামসু এখন ফোনে কথা বলছে, সম্ভবত তার বস মোস্তাফিজের সাথে। আবার অন্য ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মেয়েটাকে খুঁজে পেলো তিনতলায় একটা টেবিলের ওপরে খাতা খুলে কী যেন লিখছে। তাহলে এ-জন্যেই মেয়েটা এখানে। আফসার একবার ভাবলো এখানেই মেয়েটাকে কিছু করা যায় কিনা। কারণ জায়গাটা নির্জন। পরক্ষণেই ভাবলো, এখানে কিছু করতে গেলে মেয়েটা যদি উল্টা-পাল্টা কিছু করে তবে বিপদে পড়তে হবে; না বাইরে যাওয়া যাবে না, ভেতরে কিছু করা যাবে, সোজা গিয়ে পড়তে হবে গন্ডার শামসুর লোকেদের হাতে। খাতায় লেখা শেষ করে মেয়েটা উঠে দাঁড়াতেই আফসার দেখতে পেলো শামসু গ্রুপ হাসপাতালের ভেতরে ঢুকছে।

মেয়েটাকে থামাতে হবে। তবে এখুনি ও সরাসরি সামনে যেতে চাচ্ছে না, তাতে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যেতে পারে। ও মোবাইলফোন বের করে মেয়েটার নম্বরে ডায়াল করলো। রিং হচ্ছে...কলটা রিসিভ করে ওপাশ থেকে 'হ্যালো' বলল কেউ একজন। কিন্তু আফসার সাথে সাথে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কেটে দিলো কলটা, তার পরিবর্তে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে দিলো। দেখা যাক মেয়েটা কী করে। আফসার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। ও দেখতে পেলো মেয়েটা মোবাইলফোন পকেটে রেখে দিয়েছিলো, মেসেজের শব্দে চমকে উঠে ফোনটা দেখলো। মেসেজ পড়ে তার ভ্রু কুঁচকে উঠলো, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে নামতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে। একটু পরেই তাকে দেখা গেল দোতলার সিঁড়ির ধাপে। গাধা নাকি মেয়েটা! মেসেজ দেখার পরও নামছে কেন?

আফসার আরেকটা মেসেজ পাঠালো। মেয়েটার হাতেই ছিলো ফোনটা, সে ওটা মুখের সামনে এনে মেসেজটা পড়ে চমকে উঠলো বলে মনে হলো

ওর কাছে, আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো একটু দ্বিধার সাথে। আবারো নিচে নামতে লাগলো। মনে মনে গালি দিলো আফসার। সে ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো। এটা খুবই স্বাভাবিক। এভাবে হুট করে উড়ো একটা নম্বর থেকে এরকম মেসেজ এলে যে-কেউই প্রথমে ধরে নেবে তার সাথে মজা করা হচ্ছে। এই মেয়েটাও হয়তো ভাবছে কেউ তার সাথে মজা করছে, হয়তো ভাবছে কি জানি কি। এখন ওর কিছু করার নেই। এখানে বসেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সেইসাথে পরিস্থিতি অনুযায়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ও দেখতে পেলো মেয়েটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে ইমার্জেন্সি এরিয়ার করিডোর ধরে সামনে এগোচ্ছে।

এতোক্ষণ মেয়েটার ওপর চোখ থাকায় সে গুন্ডাদের দলের দিকে নজর দিতে পারেনি। ওদিকে চোখ ফেরাতেই হাসপাতালের সদর দরজার বাইরে কাউকেই দেখতে পেলো না। গেল কই ব্যাটারা? বেশি খুঁজতে হলো না। অন্য মনিটরে তাকাতে দেখতে পেলো তিনজনই হাসপাতালের দরজার ভেতরে প্লাজা এরিয়ায় রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শামসু রিসেপশনিস্টের সাথে কথা বলছে, আর অন্যদিকে মেয়েটা প্লাজা এরিয়াতে ঢোকার করিডোরের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে ওখানে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করছে।

যাক, একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ অন্তত করছে, আফসার মনে মনে ভাবলো। এমন সময় ও দেখতে পেলো শামসু রিসেপশনিস্টের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে ছেলেটার কলার ধরে ওপরে তুলে ফেলতেই ছেলেটা হাত নেড়ে ইমার্জেন্সি এরিয়ার দিকে দেখাতে লাগলো, ঠিক যেখানে ডাক্তার মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। শামসুসহ ওর গ্যাঙের সবার মাথা ঘুরে গেল ওদিকে। সাথে সাথে মেয়েটা চট করে সরে গেল।

আফসার ওর মোবাইলফোন বের করে মেয়েটাকে দ্রুত টেক্সট করলো। টেক্সটটা পাঠানোর সাথে সাথে ওর মনে হলো, ও মেয়েটাকে কী করতে হবে এই নির্দেশনা দেয়নি, ও আরেকটা টেক্সট পাঠিয়ে দিলো। শামসুর দলের লোকজন ইমার্জেন্সি এরিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর মেয়েটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে বোকার মতো। মনে মনে আফসার গালি দিতে লাগলো, গাধিটা করছে কি। ও কি দ্বিতীয় মেসেজটা পড়েনি? ঠিক তখুনি মেয়েটা মোবাইল হাতে নিয়ে দ্বিতীয় মেসেজটা পড়ার সাথে সাথেই ঘুরে

রওনা দিলো উল্টো দিকে।

পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে এমন সময় ওর কাঁধের ওপরে একটা ভারি হাত এসে পড়লো। চমকে উঠে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলো ও। অন্যদিকের ব্যস্ততায় ভুলেই গেছিলো ঘুমন্ত গার্ডের কথা। ব্যাটা নিশ্চই হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে ওকে দেখে চমকে গেছে, ঠিক ও যেমনটা চমকে উঠেছে লোকটা ওর কাঁধে হাত রাখাতে।

"এই, কেডারে তুই?" লোকটা আধো ঘুমের ঘোরে খুবই অবাক হয়ে ওকে দেখছে। এর আগে কাউকে সিকিউরিটি রুমে ঢুকে এভাবে মনিটরে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখেনি। তার সতেরো বছরের অভিজ্ঞতায় এরকম হয়নি কখনো। তার অভিজ্ঞতা বলে, সিকিউরটি মনিটরিঙের কাজ হলো সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ, অকারণে সারাদিন মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকা। তাই সে সারাদিন তাকিয়ে না থেকে সারাক্ষণই ঘুমিয়ে কাটায়। কিন্তু আজ সেটাতে ব্যাঘাত ঘটেছে, তার অভিজ্ঞতায় এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার।

আফসার লোকটার কথার জবাব না দিয়ে তার হাতের ওপর দিয়েই মনিটরের দিকে তাকালো, দেখতে পেলো মেয়েটা দৌড়ে চলেছে, ঠিক তার পাশের মনিটরে দেখা গেল শামসু আর তার দুই সঙ্গিও একই দিকে চলেছে। মেয়েটার চলার ভঙ্গি দেখেই আফসার বুঝে গেল ও আসলে কী করতে চাইছে।

"এই, জিগাইলাম না, কেডা তুই? এইহানে ঢুকছোস ক্যামনে?" বলে লোকটা থুতনি ধরে আফসারের দৃষ্টি তার দিকে ঘুরিয়ে দিলো।

খুবই শান্তভাবে তার চোখের দিকে তাকালো আফসার। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমি তোর বাপ।" সাথে সাথে ওর একটা হাটু সমস্ত শক্তি দিয়ে উঠিয়ে আনলো ভীষণ মোটা লোকটার উরুসন্ধি বরাবর। যেকোন অবস্থায়, যেকোন সময়, যেকোন আকৃতির পুরুষকে কাবু করতে এরচেয়ে কার্যকর মার এখনো আবিষ্কার হয়নি। আফসার বহু জায়গায় বহু জনের ওপরে এটা প্রয়োগ করেছে। এখন পর্যন্ত ওর সফলতার হার একশত ভাগ।

কিন্তু এই লোকটাকে মেরে ও অবাক হয়ে গেল। কারণ ওর শক্তিশালী মারের চোটে লোকটার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলেও চেহারায় কোন প্রভাব দেখা গেল না। বরং মার খেয়ে এই লোকের মুখ .কমন হাসি হাসি হয়ে

গেল। আফসার অবাক হয়ে দেখলো লোকটা মৃদু হাসছে। কিন্তু ওকে আরো অবাক করে দিয়ে লোকটার হাসি যেন মুখের ভেতরেই জমে গেল, সাথে সাথে ঢলে পড়ে গেল চেয়ারটার ওপরেই। আফসার আশ্চর্যের সাথে লোকটার পড়ে যাওয়া দেখলো। মার খেয়ে কেউ হেসে অজ্ঞান হয়ে যায় এরকম ঘটনা আগে দেখেনি।

কিন্তু বেশি অবাক হবার সময় নেই। ওকে যেতে হবে। শেষবারের মতো মনিটরে শামসু গ্যাঙ এবং মেয়েটার গতিবিধি দেখে ও বেরিয়ে এসে করিডার ধরে ছুটলো।

ও ইমার্জেন্সি রুম থেকে বেরিয়ে মোবাইলে হাসপাতালের ম্যাপটা বের করে আনবে, এমন সময় বেশ জোরে ধাক্কা লাগলো আরেকজনের সাথে। ও ঠিক যে-গতিতে ছুটছিলো ওই লোকটাও একই গতিতে এগিয়ে আসছিলো। ধাক্কা লেগে আরেকটু হলে দু-জনেই পড়ে যাচ্ছিলো। লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে চট করে ওর একটা হাত ধরে ফেললো। আফসার নিজেকে সামলে নিতেই চেক শার্ট পরা লোকটা বলে উঠলো, "সরি।"

আফসার কিছু না বলে হাত নাড়লো। ও ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো তার আগেই লোকটা জানতে চাইলো, "সিকিউরিটি রুমটা কোনদিকে?"

আফসার এবারও তার কথার জবাবে কোন কথা না বলে হাত তুলে করিডোরের শেষ মাথায় সিকিউরিটি রুমটা দেখিয়ে দিলো। লোকটা এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয় প্রায় দৌড়ে রওনা দিলো ওদিকে। আফসারও তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলো এক মুহূর্ত।

কিন্তু চেক-শার্ট পরা লোকটাকে নিয়ে আফসারের মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি লেগে রইলো। লোকটা কি ওর পরিচিত নাকি অন্য কোথাও দেখেছে? আর হাসপাতালের ভেতরে এভাবে ছুটছিলোই বা কেন? সিকিউরিটি রুমের দিকেই বা গেল কেন? ব্যাটা কি পুলিশ? নাকি ওরই মতো অন্যকোন...সব ভাবনা-চিন্তা বাদ দিয়ে আফসার প্রায় ঝড়ের বেগে চলে এলো হাসপাতালের পেছন দিকে। সামনে দিয়ে নেমে লাভ নেই। কারণ শেষবার যখন দেখেছিলো মেয়েটা হাসপাতালের পেছন দিকেই আসছিলো। আফসার যতোটুকু বুঝতে পেরেছে মেয়েটা শামসু গ্যাঙের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সম্ভবত হাসপাতালের পেছন দিকে যাবার চেষ্টা করছে। কারণ ম্যাপে দেখেছে পেছন দিকে একটা এক্সিট আছে। কিন্তু মেয়েটা তো

আর জানে না, পেছনের গেটেও শামসুর লোক আছে। আফসার দোতলা থেকে সিঁড়িগুলো একরকম উড়ে নেমে এলো, কিন্তু নিচে এসে থমকে গেল এক মুহূর্তের জন্যে।

এখন কি করবে, এখানে তো আর সিসি ক্যাম নেই যে ওরা কোথায় আছে দেখে নেবে। ও ম্যাপটা এক পলক দেখে নিলো। এখান থেকে পেছনের এক্সিট কয়েকটা ওয়ার্ড পরেই। ও দ্রুত রওনা দিলো ওদিকে। এখান থেকে ভেতর দিয়ে গেলে ওদেরকে ধরে ফেলার একটা সম্ভাবনা আছে। দুটো ওয়ার্ড পার হয়ে তিন নম্বর ওয়ার্ডের দিকে এগোবে হঠাৎ ডাক্তার মেয়েটাকে এক ঝলক দেখতে পেলো। পেছনের এক্সিটে যাবার জন্যে শেষ ওয়ার্ডটাতে ঢুকে গেল সে। এটা পার হলে অরেকটা করিডোর, সেখান থেকে সোজা বারান্দা আর বারান্দা থেকে পেছনের এক্সিট। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো মেয়েটার পিছু শামসুর লোক তিনজন ঢুকে গেল অন্য পাশের একটা ওয়ার্ডে। ও ম্যাপে দেখতে পেলো এখান থেকে বারান্দায় যাবার জন্যে যে করিডোর আছে ওটা দিয়ে শর্টকাট এক্সিটে বেরোবার বারান্দায় যাওয়া সম্ভব। ও আন্দাজে দৌড় দিলো করিডোরটা ধরে। এক দৌড়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। বারান্দায় বেরিয়েই দেখলো কেউ নেই। ওরা এখনো এখানে এসে পৌঁছায়নি। ও শর্টকাটে আসাতে আগেই পৌঁছে গেছে। বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো বাইরেও শামসুর লোক দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা যদি এদিক দিয়ে বাইরে বের হবার চেষ্টা করে তবে ধরা পড়ে যাবে, ভেতরে থাকলেও ধরা পড়বে। এখন একটাই রাস্তা আছে। মেয়েটা এখানে পৌঁছানো মাত্র ওকে মাঝখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ও অন্ধকার করিডোরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো মেয়েটা ওয়ার্ডের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এইমাত্র। সাথে সাথে করিডোরের অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে ফেললো। মেয়েটা এদিক দিয়েই যাবে আর তখনই ওকে আটকাতে হবে।

ও করিডোরের অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে ওঁৎ পেতে রইলো। মেয়েটা বেশ জোরে হাটতে হাটতে করিডোরের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে একহাতে ওর হাত চেপে ধরে অন্যহাতে চেপে ধরলো মুখটা।

কানের কাছে ঠান্ডা গলায় বলে উঠলো, “বাঁচতে চাইলে চুপ থাকুন।”

মেয়েটাকে করিডোরের ভেতরে নিয়ে এসে আরো শক্ত করে ওর মুখ

চেপে ধরে নিয়ে এলো করিডোরের ভেতরে। "শশশ।"

বারান্দায় শামসু তার দুই সঙ্গির সাথে মেয়েটাকে খুঁজছে। "ওরা আপনাকেই খুঁজছে।"

একটু পরে ওরা চলে যেতে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো, "এখন বিশ্বাস হলো?"

"আপনি কে?" মেয়েটা জোরে জোরে দম নিতে নিতে জানতে চাইলো।

কথার জবাব না দিয়ে বরং শেষবারের মতো বাইরে দেখে নিয়ে হাত ধরে মেয়েটাকে বাইরে নেয়ার চেষ্টা করতেই এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটা জোরে বলে উঠলো, "কে আপনি? আপনার সাথে আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

আফসার চট করে পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটু আগে পাঠানো টেক্সটগুলো বের করে মেয়েটার চোখের সামনে তুলে ধরলো। "আপাতত এর চেয়ে বেশি পরিচয় দিতে পারবো না। আসলে আসুন না হলে মরুন। আমি আপনার জন্যে মরতে পারবো না," বলে ও গেটের উল্টোদিকে হাটতে লাগলো।

"আপনি ওদিকে যাচ্ছেন কেন? বের হবার গেট তো অন্যদিকে।"

আফসার কিছুই না বলে মেয়েটাকে বারান্দার গ্রিলের বাইরে শামসুর পাহারারত লোকটাকে দেখিয়ে বলল, "শুধু এখানেই না। সামনের মেইন গেটের কাছে আছে আর আউটডোর দিয়ে বেরুবার যে রাস্তাটা আছে ওখানেও লোকজন আছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন," বলে ও মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর একটা ইশারা করলো।

"তাহলে বের হবো কোন দিক দিয়ে?" মেয়েটা দূর্বল স্বরে জানতে চাইলো, "এরা আমাকে ধরতে চাইছে কেন? আর আপনিই বা কে?"

"আমি সব বলবো আপনাকে কিন্তু এই মুহূর্তে–" এই পর্যন্ত বলতেই একটা চিৎকার ভেসে এলো করিডোরের অপর প্রান্ত থেকে। আফসার চট করে ওদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো শামসু বাহিনীর একজন ওদেরকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করছে।

"সময় নেই," বলে সে দৌড় দিলো বারান্দার অপর দিকে। মেয়েটাও প্রাণপনে দৌড়াতে লাগলো।

“সিকিউরিটি...আমাদের উচিত সিকিউরিটিকে কল করা,” দৌড়াতে দৌড়াতেই মেয়েটা বলল।

সিকিউরিটির কথা বলাতে ওর সিকিউরিটি রুমের সেই মোটকুর কথা মনে পড়ে গেল। এতো বিপদের ভেতরেও হেসে ফেললো ও। “এরা সিকিউরিটির বাপ। জান বাঁচাতে হলে পালাতে হবে।”

সিঁড়ি ঘরের কাছাকাছি পৌছে আফসার মেয়েটার একটা হাত ছেড়ে দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে বলতে লাগলো, “আমাকে ফলো করুন।” কথাটা বলেই ও কয়েক লাফে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি দৌড়ে উঠে এলো। সিঁড়ির ওপরের দিকে পৌছে দেখেলো মেয়েটা তুলনামূলক আস্তে আস্তে উঠছে। ও ভাবলো দ্রুত ওপরে উঠে একবার ম্যাপটা দেখে নিয়ে ফায়ার-এস্কেপের সিঁড়ি কোনদিকে আছে সেটা দেখে নিবে। পালানোর জন্যে একটা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে ওর। যেহেতু সবদিকে শামসুর লোক পাহারা দিচ্ছে কাজেই ওরা চেষ্টা করবে ফায়ার-এস্কেপের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার। তারপর দেয়াল টপকে বা অন্যকোন দিকে দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে পালাবে।

ও সিঁড়ির ওপরের ধাপে উঠেই মোবাইলটা বের করলো ম্যাপ দেখার জন্যে। কিন্তু সেটা চেক করার আগেই দেখতে পেলো একটা ছায়া-মূর্তি দৌড়ে আসছে এদিকে। লোকটা ওকে দেখার আগেই আফসার চট করে একবার দেখে নিয়েই বুঝে গেল পরিস্থিতি যা ভেবেছিলো তারচেয়েও খারাপ। সে মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে উল্টো দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো। যে ছায়ামুর্তিটা দৌড়ে আসছে এটা সেই চেক শার্ট পরনে লোকটা, যার সাথে সিকিউরিটি রুমের বাইরে ওর ধাক্কা লেগেছিলো। লোকটা দৌড়ে আসছে সেটা সমস্যা না, কিন্তু তার হাতে লম্বা নলের একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে, সেটাই সমস্যা। আফসার চাইলে অবশ্য তাকে ঠান্ডা করে দিতে পারতো কিন্তু এই মুহূর্তে ও ঝামেলা এড়াতে চাইছে। উল্টো সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখে মেয়েটা উঠে আসছে। মেয়েটা ওকে দেখে থমকে গেল আর ও ঝড়ের বেগে নেমে এলো নিচে।

“কি ব্যাপার, আবার–” মেয়েটা কথা শেষ করার আগেই তাকে এক ঝটকায় সিঁড়ির গোড়ায় এনে মুখ চেপে ধরলো। “বিপদ।”

সিঁড়ির ওপর থেকে হালকা একটা পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

একটু পরেই লোকটার শরীরের একটা পাশ দেখতে পেলো আফসার। চেক শার্ট পরা লোকটা ওদের সামনে দিয়ে পিস্তল হাতে নিয়ে মোবাইলে কথা বলতে বলতে চলে গেল।

"জলদি চলুন, এখনই সুযোগ। পালাতে হবে।"

"কে এই লোকটা? এর হাতেও দেখি পিস্তল? হাসপাতালের সিকিউরিটিরা গেল কোথায়?"

"আমি আপনাকে বলেছিলাম না এরা সিকিউরিটির বাপ।"

"কিন্তু এই লোকটা কে?"

"কে জানে? আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখি ওপর থেকে নেমে আসছে, হাতে পিস্তল...নিশ্চই ওই লম্বুর দলের লোকই হবে। এখন কথা না বলে..."

মেয়েটা কথা শেষ করার আগেই নিচ থেকে ভেসে এলো চিৎকার আর গুলির আওয়াজ। "জলদি জলদি!"

"এই ফ্লোরে ফায়ার-এস্কেপের সিঁড়ি কোন দিকে?" দৌড়াতে দৌড়াতে আফসার প্রশ্ন করলে।

"আমার সাথে আসুন। এদিকে," মেয়েটা ওকে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা টেরেসের সামনে চলে এলো।

"এখানে কোনদিকে?"

মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে হাত তুলে ইশারায় ওকে দেখিয়ে দিলো একপাশের একটা দরজা।

আফসার দরজাটা এক নজর দেখেই আতঙ্কের সাথে চিৎকার করে উঠলো, "শিট।"

"কি...কি ব্যাপার?" মেয়েটা জানতে চাইলো।

"দরজায় তো তালা," আফসার রীতিমতো নার্ভাস বোধ করতে শুরু করেছে।

"কি? ইর্মাজেন্সি দরজায় তালা! এখন কি করা?" বলে মেয়েটা একটু থামলো। তাকেও বেশ নার্ভাস আর অসহায় দেখাচ্ছে। "বের হবার তো এই একটা পথই আছে।"

"হাসপাতালের আর কোন দিকে কি এরকম ইমার্জেন্সি দরজা আছে?"

"আ-আমি জানি না। মনে হয় দোতলা থেকে প্রতি ফ্লোরেই আছে।

আর থাকলেও বা লাভ কি? আমরা কি ওখানে পৌছাতে পারবো?"

"হুম, সেটাও সম্ভব হবে না। কারণ..."

"কারণ একদল অস্ত্রধারি লোক আমাদের ধরার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাসপাতালে। আচ্ছা, ব্যাপার কি? এরা আমার পিছে লেগেছে কেন?"

"দেবো, সব উত্তরই দেবো," আফসার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে হঠাৎ মেয়েটার মাথা ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেল পেছনের দেয়ালে। ওখানে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখা যাচ্ছে। ওটা দিয়ে তালা ভাঙার একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। "দারুন।"

মেয়েটা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, "এটা দিয়ে কী হবে?"

আফসার মেয়েটার কথার জবাব না দিয়ে সিলিন্ডারটা দু-হাতে শক্ত করে ধরে ইমার্জেন্সি দরজায় লাগানো তালার ওপরে নামিয়ে আনলো। খটাং করে তীব্র শব্দ হলো। আবারো তালার ওপরে আঘাত করলো সিলিন্ডার দিয়ে, এভাবে বার বার।

মেয়েটা অস্থিরতার সাথে জানতে চাইলো, "খোলা যাবে?"

"আর একটু," ও আরেকবার আঘাত আগেই একটা গুলির শব্দ আর সেই সাথে ছিটকে পড়লো তালাটা। ও দেখলো করিডোরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে লম্বুর এক লোক গুলি করছে। আরেকবার গুলি হতেই দরজাটা খুলে গিয়ে প্রচন্ড শব্দে বাড়ি খেলো অন্যপাশে।

আফসার আড়াল তৈরি করার জন্যে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সিলিন্ডারটা সোজা করে ওদের চারপাশে একরাশ গ্যাস ছিটিয়ে দিয়ে মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো বাইরে। দ্রুতবেগে নামতে লাগলো প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে।

ওরা প্রায় মাঝামাঝি নেমে এসেছে এমন সময় ওপর থেকে মোটকুর দলের লোকটা গুলি করলো। গুলিটা লোহার সিঁড়িতে লেগে এদিক-ওদিক ছিটকে গেল। আফসার সাথে সাথে একহাতে মেয়েটাকে আড়াল করে অপর হাতে পিস্তল বের করে পর-পর দু-বার গুলি করেই আবার নামতে লাগলো নিচের দিকে।

আর এক কি দুই সিঁড়ি বাকি আছে এমন সময় খটাং করে আবারো গুলি এসে লাগলো লোহার সিঁড়িতে। এবার গুলি এসেছে নিচের দিক থেকে। আফসার অনুভব করলো ওরা একেবারে মাঝামাঝি একটা অবস্থায়

আটকে গেছে। নিচের লোকটা আরেকটু সামনে এগিয়ে আসতেই আফসার মরিয়া হয়ে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়ে সিঁড়ির ওপর থেকে সোজা লাফ দিলো নিচের দিকে। সে ল্যান্ড করলো একেবারে লোকটার ঘাড়ের ওপরে। সাথে সাথে লোকটার পিস্তল ধরা হাতটা একপাশে কাত হয়ে শরীরের নিচে চাপ পড়ে মট করে ভেঙে গেল। আফসার নিজেও ব্যথা পেলো ডান কাঁধে। তবে এই ব্যাটাকে কাবু করতে পারার সন্তুষ্টির তুলনায় সেটা কিছুই না। ও মাটি থেকে লোকটার পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে সামান্য টলতে টলতে উঠে দাঁড়াতেই একসাথে দুটো দৃশ্য দেখতে পেলো।

ডাক্তার মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছে। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়, ভয়ে আতঙ্কে তাকে দেখাচ্ছে একটা বাচ্চা কবুতরের মতো। একইসাথে সে দেখতে পেলো দুদিক থেকে দুটো গ্রুপ ছুটে আসছে ওদের দিকে। একদিকে সেই চেক শার্ট, সে বেশ খানিকটা দূরে, হাসপাতালেল সদর দরজার ওদিক থেকে আসছে। অন্যদিকে শামসু তার বাহিনী নিয়ে তেড়ে আসছে। আফসার বুঝলো এখান থেকে এই মুহূর্তে ভাগতে না পারলে নিজেও ধরা খাবে আর মেয়েটাকে উদ্ধার করার তো প্রশ্নই আসে না।

সে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা মেয়েটার এক হাত ধরে দৌড় দিলো কেয়ারি করা বাগানের দিকে।

দৌড়াতে দৌড়াতেই মেয়েটা জানতে চাইলো, "আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?"

"দেয়ালের বাইরেই আমার গাড়ি দাঁড় করানো আছে।"

ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলো একপাশের বাগানের কাছের দেয়ালে।

"আমি আপনাকে উঁচু করে ধরবো, আপনি উঠে যাবেন, পারবেন না?"

মেয়েটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই আফসার ওকে দেয়ালের ওপরে তুলে দিলো। সাথে সাথেই সে-ও নেমে এলো দেয়ালের অন্যপাশে।

"গাড়ি কোথায়?" মেয়েটার প্রশ্ন।

"ওই যে," বলে ও গাড়িটা দেখিয়ে দিলো।

দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠে বসেই আফসার প্রায় সাথে সাথেই স্টার্ট দিয়ে ফেললো গাড়িটা। একটানে হুইল ঘুরিয়ে ওটাকে তুলে ফেললো রাস্তার

ওপরে। ভিউ মিররে ও দেখতে পেলো পেছন পেছন এখনো দৌড়ে আসছে সেই চেক শার্ট। প্রাণপণে দৌড়ে ওদের গাড়ির পেছনে কিছুদূর এসে থেমে গেল চেক-শার্ট। গাড়িটা মূল রাস্তায় উঠতেই ফুল-স্পিড দিয়ে দিলো ও।

"উফ্, বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি। এবার আপনি আমাকে বলুন হচ্ছেটা কি এখানে? আপনি আমাকে এভাবে বাঁচালেনই বা কেন?" মেয়েটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল।

মনে মনে আফসার ভাবলো, তোমার বিপদ মাত্র শুরু হলো ডাক্তার। গাড়ি চালাতে চালাতে হেসে ফেললো ও। "ধীরে ম্যাডাম, ধীরে। আগে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে থ্যাঙ্কস তো বলুন। পরে না হয় সব বলছি।"

"প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সত্যিই থ্যাঙ্কস। কিন্তু আমার অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানার আছে। আগে আমাকে বলুন, এরা কারা? এরা কেন আমাকে মেরে ফেরতে চাইছে? আর আপনি সেটা জানলেন কিভাবে? আপনি আমাকে বাঁচাতে গেলেন কেন? সবচেয় বড় প্রশ্ন, আপনি কে?"

"ম্যাডাম, অস্থির হবেন না। আমরা বিপদ কাটিয়ে উঠেছি। সব বলবো আপনাকে, তার আগে আমি নিজের পরিচয়টা দিয়ে নেই। আমি ডিবি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার আরিফ। আরিফুর রহমান," বলে ও তুলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

"কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা দরকার," মেয়েটা সিরিয়াস ভঙ্গিতে জানতে চাইছে।

আফসার তার কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করলো। ওটা ওপেন করে দেখলো ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা মেসেজ আর কল এসেছে। এর মধ্যে তার নিয়োগকর্তার কল আছে বেশ কয়েকটা, আর হাসপাতালের বাইরে পাহারায় থাকা সেই স্যাঙ্গাতের কলও আছে। সে প্রথমেই তার স্যাঙ্গাতকে মেসেজ পাঠিয়ে দুটো নির্দেশনা দিলো। তার দলকে রেডি থাকার নির্দেশ দিতে বলল, আর দুই তাদের বর্তমান অবস্থান জানিয়ে নির্দেশ দিলো বাইকে করে ওদের গাড়িটার পিছু পিছু আসতে। এই মুহূর্তে মেয়েটাকে তার নিয়োগকর্তার কাছে পৌছে দেয়ার কোনই ইচ্ছে নেই। মেয়েটাকে নিয়ে ওর নিজের পরিকল্পনা আছে। মেসেজ শেষ করে মোবাইলটা পকেটে রাখতে গিয়ে অনুভব করলো কোমরে গুঁজে রাখা দুটো পিস্তল গুঁতো মারছে। একটা নিজের, অন্যটা শামসু গ্যাঙের ওই

ব্যাটার–যার ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়েছিলো ও। দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করে ও গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিলো।

মেয়েটা পিস্তল রাখা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, এরপর আবারো জানতে চাইলো, "কি ব্যাপার? আপনি আমার কথাগুলোর জবাব দিচ্ছেন না যে?"

"ওহ্, আমি সরি। ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেকগুলো কল-মেসেজ এসেছিলো ওগুলোর জবাব দিলাম," কথা বলতে বলতে ও গাড়িটার গতি একদম কমিয়ে আনলো, যাতে ওর স্যাঙ্গাত বাইক নিয়ে দ্রুত ওদের কাছাকাছি পৌঁছে অনুসরণ করতে পারে। "হ্যা, কী যেন জানতে চাইছিলেন?"

"পুরো ঘটনাটা," মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো। "কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? সেই সাথে এই লোকগুলো আমাকে কেন মারতে চাইছে? আর আপনারাই বা একেবারে সঠিক সময়ে এ-ব্যাপারে জানতে পারলেন কিভাবে?"

"সব বলবো কিন্তু এখন না। আগে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাই। সবই বলবো আপনাকে।"

"তার মানে, আমরা এখন আপনাদের হেডকোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছি?"

কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়লো আফসার। ভিউ মিররে একটা হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। আফসার পেছন ফিরে বোঝার চেষ্টা করলো ওটা ওর সাগরেদের বাইক নাকি অন্যকেউ। পেছন দিকে দেখতে দেখতেই সে বলতে লাগলো, "মিস তুলি, আমি যতো দ্রুত সম্ভব হেডকোর্টারে পৌঁছাতে চাই কারন..."

"আপনি কি কোন বিপদের...?" তুলি প্রশ্নটা শেষ করার আগেই হঠাৎ পাশ থেকে আচমকা আসা আলোয় ওদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল।

ওদের গাড়িটা যাচ্ছিলো একটা গলির সামনে দিয়ে। আচমকা গলির ভেতরে প্রথমে একটা তীব্র আলো জ্বলে উঠলো, সাথে সাথে ভয়ঙ্কর গর্জন করে একটা জিপ বাঘের মতো লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে সোজা বাড়ি মারলো ধীর গতিতে চলতে থাকা ওদের গাড়ির একদম সামনের দিকে।

বাড়ি লাগার সাথে সাথে ওদের গাড়ির সামনেটা অনেকখানি ঘুরে গেল ডানদিকে। গাড়ির নাক ঘুরে গিয়ে বাড়ি মারলো মূল রাস্তার ডানদিকের আইল্যান্ডে। বাড়ি খেয়ে ওদের গাড়ির পেছনটা উল্টোদিকে ঘুরে জিপটার

পাশে শক্তিশালী একটা ধাক্কা খেয়ে একটা পাশ বাঁকা হয়ে উল্টে গেল।

ওদের গাড়ির একটু পেছনেই আসছিলো সেই বাইকটা। ওদের গাড়ি চলছিলো বেশ ধীর গতিতে। আর উল্টোদিক থেকে আসা বাইকটার গতি ছিলো অনেক বেশি। ওদের গাড়িটা বাড়ি খেয়ে থেমে যেতেই বাইকওয়ালা আর বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। বাইকটা তীব্র গতিতে এসে গাড়িটার পেছনে বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লো একদিকে, বাইকের মালিক ছিটকে পড়লো আরেকদিকে।

গলি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটা যখন বাড়ি মারে আফসার তখন উল্টো ঘুরে পেছনে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলো ওর সাগরেদ বাইক নিয়ে এসেছে কিনা। উল্টো ঘোরা অবস্থাতেই ওর শরীরের একটা পাশে শক্ত ধাক্কা লেগে সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় সে।

গাড়িটা উল্টে যাবার ঠিক আগমুহূর্তে তুলি ছিটকে পড়ে গাড়ির বাইরে। গাড়ির বাইরে রাস্তার আইল্যান্ডে বাড়ি খেয়ে অনেকটা অচেতনের মতো হয়ে পড়ে। কিন্তু ওর জ্ঞান ফিরে আসে প্রায় সাথে সাথেই দেখতে পায় ওদের গাড়িটা উল্টে পড়ে আছে আর ওটার পেছনে একটা বাইক পড়ে আছে কাত হয়ে। ওদের গাড়ির অন্যপাশে স্থির হয়ে আছে একটা সাদা রঙের জিপ। কপাল কেটে গিয়ে রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা নেমে আসছে ওর কপাল বেয়ে। এর ফলে চোখের দৃষ্টিও হয়ে গেছে একটু ঝাপসা।

ঝাপসা দৃষ্টি হলেও তুলি পরিস্কার দেখতে পেলো ওদের গাড়ির অন্যপাশের জিপের দরজা খুলে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। মানুষটা ধাম করে জিপের দরজা লাগিয়ে ওদের গাড়িটা ঘুরে এদিকে আসতে লাগলো আর সাথে সাথে তুলি চিনতে পারলো লোকটাকে। হাসপাতালের সেই চেক-শার্ট লোকটা। এখনো তার পরনে সেই শার্টটাই রয়েছে।

লোকটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে, তুলি সচেতন হয়ে উঠলো। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পায়ের গোড়ালিতে খচ করে উঠলো। ওঠার চেষ্টা না করে ও মরিয়া হয়ে ওদের গাড়ির দিকে এগোতে লাগলো পা টেনে টেনে। গাড়িটার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে আর লোকটাও এগিয়ে আসছে। উল্টে থাকা গাড়িটার কাছে আসতেই গাড়ির খোলা দরজার বাইরে পড়ে থাকতে দেখলো একটা পিস্তল। এটা কোথা থেকে এসেছে ও জানে না

কিন্তু পিস্তলটা তুলে নিলো। ওর পক্ষে তো আর জানা সম্ভব নয় এটা শামসুর লোকের সেই পিস্তল, যেটা আফসার গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের ভেতরে রেখেছিলো। অ্যাক্সিডেন্টের সময়ে কম্পার্টমেন্ট খুলে সেটা বাইরে ছিটকে পড়েছে।

পিস্তলটা দেখার সাথে সাথেই তুলি সেটা তুলে নিলো। একটু ঝাঁকি দিয়েই বুঝতে পারলো এটাতে গুলি ভরাই আছে। পেছনের হ্যামার টেনে লোড করে ফেললো পিস্তলটা। ওর পেছনে পায়ের আওয়াজ একেবারেই কাছে চলে এসেছে। ও উল্টো হয়ে রাস্তার ওপরে শুয়ে পিস্তলটা বুকের সাথে চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। পায়ের শব্দটা একেবারে ওর পেছনে এসে থেমে গেল। একটু পরেই একটা হাত চেপে ধরলো ওর কাঁধ। সাথে সাথে এক পাক উল্টো ঘুরে গুলি করে দিলো ও।

পুলিশ অফিসার

লাইফ-লাইন হাসপাতালের পেছন দিকে
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
রাত–১০:৪৫

পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিনিয়র এএসপি তানভীর হোসেন এক ঝলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নিলো। এমনিতে সে খুব ঠান্ডা একজন মানুষ, খুব কম ক্ষেত্রেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় কিন্তু আজ এমন একটা পরিস্থিতিতে কিছুতেই নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। তার জীবন, ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত ইমেজ, সেইসাথে গত কয়েক মাসের পরিশ্রম নির্ভর করছে আগামি কয়েক ঘন্টার ওপর।

সিনিয়র এএসপি তানভীর হোসেন জিপের ভেতরে বসে ছটফট করছে আর বার বার ঘড়ি দেখছে। যে-ইনফর্মারকে ভেতরে পাঠিয়েছে ওই ব্যাটার এতো সময় লাগছে কেন? এই গাধাটার কারণেই সবকিছু এখন গুবলেট হবে মনে হচ্ছে।

ইশ্...গত কয়টা মাসের পরিশ্রম।

সিনিয়র এএসপি তানভীর হোসেন আজ থেকে বছর দুয়েক আগেও ছিলো বাংলাদেশ পুলিশের জুনিয়র এবং তরুণদের ভেতরে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একজন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে প্রথম বিসিএস দিয়েই সরাসরি এএসপি হিসেব নিয়োগ পেয়ে যায় উপ-সচিবের ছেলে তানভীর। গর্বিত বাবার গর্বিত ছেলে। ছয় ফিট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ তানভীর দেখতে যেমন, কাজেও তেমন। সারদা থেকে ট্রেনিং শেষ করে উপ-সচিব বাবার কারণে সরাসরি পোস্টিং পায় ঢাকায়। সুদর্শন চেহারা, সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারের কারণে পটিয়ে ফেলে এক সিনিয়র অফিসারের সুন্দরি কন্যাকে। তাদের বিয়েটা ছিল বাংলাদেশ পুলিশ ফোর্সের সবচেয় জমকালো বিয়েগুলোর একটি। পুলিশ ফোর্স, মিডিয়া থেকে শুরু করে দেশের সবোর্চ্চ পর্যায়ের লোক সমাগমে পরিপূর্ণ ছিলো অনুষ্ঠানটি। তাই বিয়ের ছ-মাসের

মাথায় তাদের ডিভোর্সটাও ছিলো একই রকম আলোচনার বিষয়।

বিয়ে এবং ডিভোর্সের ঘটনা তানভীরের জীবন বদলে দেয়। এতো অল্প বয়সে এতো-এতো সাফল্য হয়তো ওকে অতিরিক্ত গর্বিত করে তুলেছিল। তাই বিয়ের পর থেকে সুখের জীবন-যাপন করলেও কেন জানি শুরু থেকেই স্বামি-স্ত্রী দু-জনার ভেতরেই একে অপরকে ডোমিনেট করার একটা প্রচেষ্টা দেখা দেয়। প্রথম প্রথম সমস্যা হয়নি কিন্তু দিন দিন এই প্রচেষ্টা অসুস্থ একটা রূপ ধারণ করতে থাকে। এর পেছনে কারণও ছিলো। তানভীর ব্যক্তিজীবন এবং কর্মজীবন দু-ক্ষেত্রেই দারুণ সফল। অন্যদিকে ওর স্ত্রী ছোটবেলা থেকে প্রভাব এবং অর্থবিত্তের মাঝে বড় হওয়া পরিবারের আদরের দুলালি। এ-কারনে দু-জনেরই ইগো ছিলো আকাশ সমান। তাই বিয়ের ক-মাসের মাথায় এমন একটা দিন ছিলো না যেদিন ওরা দু-জন ঝগড়া করতো না। এরপরে এলো সেইদিন। তানভীরের অফিসে সেদিন খুব ঝামেলা ছিলো। সারাদিন ডিউটি করে এমনিতেই খিঁচড়ে ছিলো ওর মেজাজ। এরপর ঘরে আসতেই বউ যখন চিল্লা-চিল্লি শুরু করলো ওর আর সহ্য হলো না, দিলো বসিয়ে এক চড়। এই এক চড় যে ওর জীবন এলোমেলো করে দেবে সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি।

বাবা বড় সরকারি অফিসার, নিজে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে আছে, ফেসবুকে ওর ফলোয়ার পঞ্চাশ হাজারের ওপরে। সৎ, আধুনিক মন-মানসিকতার অধিকারি হিসেবে পরিচিত এরকম একজন পুলিশ অফিসার হয়েও একটা চড়ের কারনে ওকে এতোটা হেনস্তা হতে হবে সে ভাবতেও পারেনি। চড় মারার সাথে সাথে তার স্ত্রী বাপকে ফোন করে। রাতের বেলাতেই তার শ্বশুড় গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। স্ত্রী একটা কথাও না বলে চলে যায় বাড়ি ছেড়ে। তানভীর এতোটা রেগে ছিলো, সে-ও কোন কথাই বলেনি, একবার বাঁধাও দেয়নি। এখন আফসোস করে কেন সেদিন একটু বোঝানোর চেষ্টা করেনি।

পরের দিন যথারীতি তানভীর অফিসে যায়, গিয়ে শুনতে পায় তাকে বদলি করা হয়েছে খাগড়াছড়িতে। ব্যাপারটা কেন হলো কিভাবে হলো একমুহূর্তের জন্যে সে বুঝতেই পারলো না। এতোদিন সিনেমায় দেখেছে এক রাতের ব্যবধানে অফিসারদের বদলি হয়ে যেতে, সেদিন নিজেকে দিয়ে প্রমাণ পেলো। সত্যি কথা হলো দুনিয়া কিভাবে চলে সেটা বুঝতে তখনো

বাকি ছিলো তার। ওইদিন বিকেলেই যখন ওর কাছে একটা ডিভোর্স লেটার চলে আসে, তখন সে বুঝতে পারে ঘটনা কি হচ্ছে। বহু অনুনয়-বিনুনয়, কাকুতি-মিনতি কিছুতেই আর কাজ হয় না। সে পরিস্কার বুঝতে পারে যদি ডিভোর্সে রাজি না হয়, খাগড়াছড়ি না যায় তাহলে সে চাকরিতে টিকতে পারবে না। আর চাকরিতে টিকতে না পারলে বেঁচে থাকাটাই ওর জন্যে কঠিন হয়ে যাবে। সে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে এর একমাত্র কারণ সে একজন পুলিশ। নিজের বাপ, নিজের বস, নিজের বন্ধু-বান্ধব সবদিক দিয়ে চেষ্টা করেও কিছুতেই কিছু হয় না। সে তার সমস্ত অর্জন, সমস্ত মান-সম্মান সবকিছু বিসর্জন দিয়ে চলে যায় খাগড়াছড়ি।

কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকে না, বিশেষ করে তার মতো মানুষের জন্যে। সেখানে বসেই সে ডিউটি করার পাশাপাশি পড়াশুনা শুরু করে। সরকারি অফিসারদের জন্যে প্রচুর স্কলারশিপ বরাদ্দ থাকে। বেশিরভাগই যোগ্য লোকের অভাবে বরং কাজে লাগে না। খাগড়াছড়ি বসেই সে এরকম একটা স্কলারশিপে আবেদন করে সেটা পেয়ে যায়, চলে যায় দেশের বাইরে। এক বছর সেখানে পড়াশুনা করে কয়েকমাস আগে দেশে ফিরে জীবনটাকে নতুন করে শুরু করার পরিকল্পনা করছে, এমন সময় তার হাতে চলে আসে বিরাট এক সুযোগ। তবে ভীষণ কঠিন আর ঝুঁকিপূর্ণ এক সুযোগ।

বাংলাদেশের এক কুখ্যাত গডফাদার, যে দুবাইতে বসে দেশের ভেতরে সমস্ত কাজ-কর্ম অপারেট করে, দুবাইতে গিয়ে স্থানিয় পুলিশের সহায়তায় তাকে ট্র্যাক-ডাউন করতে হবে, বাংলাদেশে তার পরিপূর্ণ নেটওয়ার্কের ব্যাপারে জেনে নিয়ে হয় তাকে হয় বন্দি করতে হবে নয়তো মেরে ফেলতে হবে। কাজটার জন্যে বিশেষ একজন অফিসারকে খোঁজা হচ্ছিলো যার বিদেশের মাটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আর ট্রেনিং আছে। সেই মুহূর্তে তানভীরের চেয়ে ভালো অপশন আর ছিলো না। সে নিজে থেকেই এই কাজের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। খুব অল্প সময়ের ভেতরেই ওকে বদলি করে দেয়া হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চে। সেখান থেকে ওকে লিডার করে একটা টিম পাঠিয়ে দেয়া হয় দুবাইতে।

দুবাই পৌছামাত্রই ওদের টিম সেই গডফাদারের লোকেদের হাতে অ্যামবুশের শিকার হয়। কোনমতে সারভাইভ করে ওরা। এরপর দুবাই

পুলিশের সহয়তায় লম্বাসময় ধরে ওদেরকে ট্র্যাক করার পর অবশেষে যখন ওর টিম সেই গডফাদার পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয় ওরা, স্পটে গিয়ে আবিষ্কার করে গডফাদার মারা গেছে, আর তার ডানহাত হিসেবে কাজ করতো যে লোক সে সবকিছু নিয়ে পালিয়ে গেছে। লোকটা পালানোর সাথে সাথে মিস হয়ে যায় সমস্ত জরুরি জিনিস যা উদ্ধার করতে সে আর তার টিম দুবাই গেছিলো। ব্যর্থ হয়ে ওরা ফিরে আসে দেশে। দেশে আসার পর জানতে পারে সেই ডানহাত চট্টগ্রাম শহরে গডফাদারের সমস্ত প্রোপার্টি থেকে শুরু করে তার সব নেটওয়ার্ক ক্লোজ করে ফেলছে। এক ইনফর্মারের মাধ্যমে তাকে ওরা স্পট করতেও সক্ষম হয়। ও টিম নিয়ে সোজা চলে আসে চট্টগ্রামে।

এখানে এসে গত এক সপ্তাহ ধরে তাকে বার বার ট্র্যাক করার চেষ্টা করার পরও লোকটা ওদের হাত থেকে পিছলে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে তানভীর আর ওর টিম যখন ভাবছে একে আর ধরা সম্ভব হবে না ঠিক তখুনিকে ইনফর্মার ওদেরকে নিশ্চিত এক খবর জানায়। এই লোক আজ রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে আগ্রাবাদে থাকবে। কিন্তু ইনফর্মার ওদেরকে জানাতে পারেনি লোকটাকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে এবং সে কেন এখানে আসছে।

প্রায় একঘন্টা আগে আগ্রাবাদে এসে ওরা ঘোরাঘুরি করছে, ইনফর্মার সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারছে না, এমন সময় ওরা খবর পায় আগ্রাবাদ লাইফ-লাইন হাসপাতালের ওখানে গোলাগুলি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সাথে সাথে তানভীর এখানে এসে পৌঁছায়। ওর ইনফর্মার দুঃখের সাথে জানায় ওই লোকের আজ লাইফ-লাইন হাসপাতালের কাছেই একজনের সাথে দেখা করার কথা ছিলো। ওরা জানতো লোকটা আগ্রাবাদে আসবে কিন্তু কোথায় আসবে জানতো না। গডফাদারের রাইট হ্যান্ড এখানে আসার পরেই তার অপজিট গ্যাঙের লোকদের হাতে অ্যামবুশে পড়ে এখন অপারেটিং থিয়েটারে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। সাথে সাথে তানভীর এই ইনফর্মারকে ভেতরে পাঠায় বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার জন্যে।

আগের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তানভীর আরেকবার অস্থির হয়ে ঘড়ি দেখলো। ওর পাশের সিটে বসা ছেলেটা বেশ আরামেই বসে মোবাইলফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। ডিউটির সময়ে এই জিনিসটা

তানভীরের একদম পছন্দ নয়। তবে এমনিতে ছেলেটা খুব কাজের। যেকোন সময়ে যেকোন অবস্থায় ওর কথা শোনে, সে-অনুযায়ি কাজ করে। ওদের স্পেশাল ফোর্সে আইটি এক্সপার্ট হিসেবে আছে ও।

"মিঠু, শোন," সে ডাক দিলো ছেলেটাকে।

"হুম...বলো," অফিসিয়ালি তানভীর ওর বস হলেও ওরা নিজেরা নিজেরা কথা বলার সময়ে নিজেদের তুই-তুমি ডাকে। দুবাই মিশনের প্রথম দিন থেকেই ওদের ভেতরে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

"এই ব্যাটা এতো দেরি করছে কেন? হাসপাতালের ভেতরে এতোক্ষণ কী করে?" তানভীর অস্থির হয়ে বার-বার জিপের বাইরে তাকাচ্ছে।

"আরে ভাই, এতো অস্থির হয়ো না তো," মিঠু একেবারে রিলাক্স। তার চোখ এখনো মোবাইলে।

"অস্থির হবো না? এই ব্যাটা একবার কিন্তু আমাদেরকে ডুবিয়েছে। আবার সেটা করবে না তার গ্যারান্টি কি? আর তোকে না বলেছি ডিউটির সময়ে মোবাইল গুতাবি না।"

মিঠু কান থেকে হেডফোন খুলে পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "হুম্, অস্থির হয়ো না। ওই দেখো, এখনো হাসপাতালে লোকজন ঢুকছে-বেরুচ্ছে," হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢুকতে থাকা একজনকে দেখালো সে। লোকটারও কানে হেডফোন, বুক খোলা শার্ট, মাথায় কালো-ক্যাপ, আর হাতে একটা স্বচ্ছ পলিথিন ব্যাগে পাউরুটি আর কলা দেখা যাচ্ছে।

"বাই দ্য ওয়ে, একটা মজার ব্যাপার কি জানো? আমি কখনো এই পাউরুটি আর কলা জিনিসটা খাইনি। মানে, দুটোই খেয়েছি কিন্তু আলাদা আলাদা, একসাথে কখনো খাওয়া হয়নি। তুমি খেয়েছো?"

"ধুর! আমি আছি চিন্তায় আর তুই আছিস তোর পাউরুটি-কলা নিয়ে," তারভীর বিরক্তির সাথে আরেকবার হাসপাতালের গেটের দিকে তাকালো।

"আচ্ছা, তুমি লোকাল পুলিশকে এই ঘটনার সাথে ইনভলভ করলে না কেন? তাহলে তো ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেতো।"

"বোকার মতো কথা বলিস না। এটা ওদের এলাকা। লোকাল ফোর্সের প্রতি পদে পদে অবশ্যই ওদের নিজেদের লোক আছে। আমাদের স্পেশাল ফোর্সেও ওদের লোক আছে ব'লে আমার সন্দেহ হয়। আর তো লোকাল পুলিশ! অপারেশনটা ওদেরকে না জানিয়ে লুকিয়ে চালাচ্ছি বলেই এই

লোকটার এতো কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছি। ওদেরকে ইনভলভ করলে এইটুকুও করতে পারতাম না।"

"তাহলে বাকি টিমকে ডেকে আনছো না কেন?"

"আরে, আগে ব্যাপারটা শিওর তো হয়ে নেই। ওরা তো কাছেই আছে। যেকোন সময় ডেকে নেয়া যাবে।"

"তোমার এই চেক-শার্টটা তো আগে দেখিনি। খুব সুন্দর, যদিও একটু কার্টুন-কার্টুন ভাব আছে। দুই মাইল দূর থেকেও এটা চোখে পড়বে," বলে সে মুখ টিপে হাসলো।

তানভীর রাগের সাথে ফিরে তাকালো ওর দিকে। "তোর মুখে আজগুবি সব কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই? একবার বলছিস পাউরুটি-কলার কথা, আরেকবার বলছিস শার্টের কথা! মাথাটা কি পুরোপুরি গেছে নাকি?"

এমন সময় ওদের জিপ থেকে কিছুদূরে একটা সাদা রঙের মাইক্রো এসে দাঁড়ালো। মাইক্রোটা থামতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো চার-পাঁচ জন লোক। সবাই এই গরমের ভেতরেও ভারি পোশাক পরে আছে। তবে সেটা দেখার বিষয় না। তানভীর অনুমান করলো, এদের মাঝে একজন লোকের হাইট সাড়ে ছয়ফিটের কম হবে না। বিশালদেহি ন্যাড়া মাথার লোকটা মাইক্রো থেকে নেমে দলের বাকিদের সাথে কথা বলতে লাগলো। তানভীরের কাছে লোকগুলোর গতবিধি খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। একটু পরেই লোকগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেল। ও একটু খেয়াল করে দেখলো লম্বুর দলের দু-জন চলে গেল দুদিকে আর বাকি দু-জনকে নিয়ে সে চললো ভেতরের দিকে।

"এই মিঠু, আমার মনে হয় কিছু একটা করা উচিত," বলে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ইনফর্মারের জন্যে আর অপেক্ষা করবে না। "শোন, তুই এখানেই থাক। আমি ভেতরে যাচ্ছি। দেখি কী ঘটছে ওখানে। আর সতর্ক থাকিস, যেকোন সময় যেকোন কিছু হতে পারে," কথাগুলো মিঠুর উদ্দেশ্যে বলে ও হাসপাতালের দিকে দৌড় দিলো। হাসপাতালে লোক সমাগম একেবারে নেই তা নয়, তবে অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় অনেক কম। গেটের কাছে পৌছাতে পৌছাতে একবার নিজের পকেটে রাখা পিস্তলটা চেক করে নিলো ও। অবাক হয়ে খেয়াল করলো এখানে কোন সিকিউরিটি

গার্ড নেই।

ব্যাপার কি? গার্ডরা গেল কই। পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে ঘোলাটে মনে হতে লাগলো।

গর্ডরা কোথায় গেছে জবাবটা পেয়ে গেল একটু পরেই। হাসপাতালের মেইন গেটের একটু দূরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে গার্ডরা। এটা কি লম্বুর দলের কাজ–মনে মনে বলে উঠলো সে।

"শিট!" আনমনেই কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, সেইসাথে বের করে আনলো পিস্তলটা, ওটার মাথায় লাগিয়ে নিলো সাইলেন্সার। ওর দিকে কে যেনে দৌড়ে আসছে, চট করে পিস্তলটা তুলে ঘুরে দাঁড়ালেও লোকটাকে দেখার সাথে সাথে সেটা নামিয়ে নিলো।

ওর ইনফর্মার।

লোকটাকে দেখে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। "ব্যাপার কি? হচ্ছেটা কি এখানে? আর তুমিই বা এতো দেরি করলে কেন?"

"স্যার, ঝামেলা হয়ে গেছে। সবকিছু বের করতে করতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ওয়ার্ড বয় আর নার্সদের কাছ থেকে কথা আদায় করা–"

"এই ফালতু প্যাচাল বাদ দিয়ে আসল কথা বলো। কি হয়েছে? এক লম্বুর সাথে আরো কয়েকজনকে দেখলাম ভেতরে ঢুকতে, আবার ওর লোকজন বাইরেও পাহারা দিচ্ছে, এরা কারা?"

"স্যার, আপনি যার পেছনে লেগেছিলেন সেই লোক গুলি খেয়ে অপারেশনের সময়ে মারা গেছে কিন্তু মারা যাবার আগে ইমার্জেন্সি এরিয়াতে ডিউটিতে থাকা এক ডাক্তারকে সব বলে গেছে। মারা যাবার আগে একমাত্র ওই মেয়ে ডাক্তারটার সাথেই কথা হয়েছে ওই লোকটার।"

"এরপর?"

"স্যার, মনে হয় আমি যেমন এই মেয়ে ডাক্তারটার ব্যাপারে জানতে পেরেছি তেমনি আমার আগেই আরো কেউ জেনে গেছে, তারাই মেয়েটার পেছনে লেগেছে এখন। ওই লম্বুটা স্থানিয় ক্যাডার, মোস্তাফিজ ভাইয়ের ডানহাত।"

"বুঝেছি। এখন শোন, তুমি দেরি করে ফেলেছো। এখান থেকে জলদি বেরিয়ে যাবে। গেটে ওই লম্বুর লোক পাহারায় আছে ওর হাতে আবার ধরা পড়ো না। এখান থেকে বেরিয়ে আমার জিপে গিয়ে দেখবে ওখানে একটা

ছেলে বসে আছে। ওর কাছে রিপোর্ট করবে। যাও।"

তানভীর দ্রুত নিজের ব্লু-টুথ কমিউনিকেশন ডিভাইস কানে লাগালো। "হ্যালো, মিঠু। শুনতে পাচ্ছিস?" ওপাশ থেকে মিঠু জবাব দেয়ার সাথে সাথে ও বলল, "শোন, অনেক কিছু ঘটে গেছে এখন, সব বলা সম্ভব না। আমি শুধু এটুকু বলছি পরিস্থিতি খুব খারাপ। ওই লোক মারা গেছে, মারা যাবার আগে একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলেছে। এখন ওই মেয়েটার পিছে লেগেছে একাধিক গ্রুপ। আমি হাসপাতালের ভেতরে ঢুকছি, তুই রেড অ্যালার্ট জারি করে দিয়ে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট কর। আর ওই ইনফর্মারকে বিদায় কর আগে," কথা শেষ করে পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে কোমরে গুঁজে রাখলো সে, যাতে যেকোন প্রয়োজনে ওটা বের করে আনতে পারে। সেইসাথে নিজের ব্যাজ আর আইডি কার্ডটা রেখে দিলো জিন্সের প্যান্টের পেছনের পকেটে। কাজগুলো দ্রুত শেষ করে ও সোজা এক দৌড়ে ঢুকে পড়লো হাসপাতালের সদর দরজা দিয়ে।

ভেতরে ঢুকতেই অনেকখানি ফাঁকা একটা একটা জায়গা, বেশিরভাগ হাসপাতালেই এরকমটা দেখা যায়। সেটার ডানদিকে বিরাট রিসেপশন। ও দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল রিসেপশনটার দিকে। ওটার ওপাশে পাংশু মুখে এক ছেলে বসে আছে। তানভীর ছেলেটার চোখে-মুখে ভয়ের অভিব্যক্তি দেখে অবাক হলো একটু। এই অভিব্যক্তি ওর পুলিশি অভিজ্ঞতায় খুবই পরিচিত একটা ব্যাপার। ছেলেটার কুঁচকে থাকা কলার দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো। কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতেই ছেলেটা আবার কুঁকড়ে গেল। ও পেছনের পকেট থেকে আইডি বের করে তুলে ধরলো ছেলেটার চোখের সামনে।

"আমি পুলিশ। কি হচ্ছে এখানে?"

"ও-ওই...ওরা তুলি ম্যাডামের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলো, আমি প্রথমে বলতে চাইনি কিন্তু," ছেলেটার কথা শুনে তানভীর অনুমান করলো, সম্ভবত ওই ডাক্তার মেয়েটার নাম তুলি। লম্বুর লোকজন সম্ভবত ওই মেয়েটার পেছনেই লেগেছে।

"ওরা কোনদিকে গেছে?"

ছেলেটা কিছু না বলে ভুতের মতো হাত তুলে দেখালো একদিকে। "ওরা ইমার্জেন্সির দিকে গেছে।"

তানভীর ইমার্জেন্সি কোনদিকে অনুমান করে সেদিকে দৌড় দিলো। একটু এগিয়েই সামনে একটা করিডোর দেখে সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সামনে আসতেই চোখে পড়লো একটা দরজার সামনে লেখা ইমার্জেন্সি। ও সোজা ওটা দিয়ে ঢুকে পড়লো, ভেতরে একজন ওয়ার্ড বয় ছাড়া আর কেউই নেই।

"ডক্টর তুলি?"

"ম্যাডাম তো একটু আগেই বের হয়ে গেছেন।"

তানভীর দৌড় দেয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ওর মাথায় একটা ব্যাপার পাক দিয়ে উঠলো। এভাবে মেয়েটাকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তারচেয়ে সিসি ক্যামের মনিটরগুলো কোথায় আছে সেটা জানতে পারলে সেখান থেকে কিছু একটা পাবার সম্ভাবনা আছে।

ও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, তোমাদের এই ক্যামেরাগুলোর রেকর্ড কোথায় রাখা থাকে জানো?"

"স্যার, আমি শিওর না, মনে হয় সিকিউরিটি রুমে।"

"সিকিউরিটি রুমটা কোনদিকে?" জানতে চাইলো তানভীর।

"স্যার, এখান থেকে এক ফ্লোর ওপরেই–"

ছেলেটা কথা শেষ করার আগেই তানভীর দৌড় দিলো সিকিউরিটি রুমের দিকে। এক দৌড়ে পার হয়ে এলো ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডটা। ছেলেটা বলেছিলো এক ফ্লোর ওপরেই। ও সোজা চলে এলো সিঁড়ি বেয়ে। এদিকেই কোথাও হবে বলে ও আবারো দৌড় দিতে যাবে ধাম করে বাড়ি খেলো একজনের সাথে। ওই লোকটাও বেশ জোরে এগোচ্ছিলো আর ও নিজে তো রীতিমতো দৌড়াচ্ছিলো। বেশ তীব্র গতিতে দু-জনে ধাক্কা খেলো একে অপরের সাথে। আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলো, কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে খপ করে সামনের লোকটার হাত ধরে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো।

নিজেকে সামলে নিয়ে লোকটা ওর দিকে হাত নেড়ে ধন্যবাদ জানালো।

তানভীর ভাবলো এর কাছে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া যেতে পারে সিকিউরিটি রুমটা কোনদিকে। "সিকিউরিটি রুমটা কোনদিকে?"

লোকটা ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো ওর প্রশ্ন শুনে হাত তুলে করিডোরের অন্যমাথায় দেখিয়ে দিলো। লোকটার দেখানো জায়গায়

তাকিয়ে তানভীর বুঝতে পারলো ও ভুল জায়গায় খুঁজছিলো এতক্ষণ। ধন্যবাদ জানানোর জন্যে ঘুরে তাকাতেই লোকটার চেহারা আর পোশাকের দিকে নজর গেল তার। এই লোকটাকেই তো ও আর মিঠু কলা আর পাউরুটি নিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে দেখেছিলো। তারা দু-জনেই এক মুহূর্তের জন্যে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থেকে দুদিকে রওনা দিলো।

তানভীর এক দৌড়ে চলে এলো সিকিউরিটি রুমে। সিকিউরিটি রুমের স্টিলের দরজাটা ধাক্কা দিতেই একটু খুলে আটকে গেল।

"হ্যালো, কেউ আছেন?" তানভীর দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া-শব্দ নেই।

"হ্যালো, কেউ নেই নাকি?" দরজাটা একটু খুলে ভেতর থেকে আটকে গেছে। জোরে ঠেলা দেয়াতে একটু একটু করে খুলছে। তানভীর সমস্ত শক্তি দিয়ে জোরে ঠেলা দিলো। দরজাটার ওপাশে কিছু একটা ছেঁচড়ে সরে গেল অনেকখানি, দরজাটাও একজন মানুষ ঢোকার মতো ফাঁক হয়ে গেল।

তানভীর ভেতরে ঢুকে পরিস্থিতি দেখে খুব একটা অবাক হলো না। ভেতরে ইয়া মোটা হাতির মতো সাইজের এক লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। লোকটা সম্ভবত বসে ছিলো চেয়ারে। জ্ঞান হারিয়ে দরজার পেছনে পড়ে যাওয়াতেই দরজাটা খোলা যাচ্ছিলো না। সিকিউরিটি রুমের ভেতরের পরিস্থিতি দেখে হঠাৎ ওর মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠলো। বাইরে ক্যাপ পরা যে-লোকটার সাথে ওর ধাক্কা লাগলো ওই লোকটা দৌড়াচ্ছিলো কেন? সে কি এখান থেকেই বেরিয়েছে? এতোসব চিন্তা বাদ দিয়ে ও সারি-সারি মনিটরগুলোর দিকে ফিরে তাকালো। মেয়েটা কোথায় আছে খুঁজে বের করতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। একটু তাকাতেই একটা মনিটরে দেখতে পেলো একটা ওয়ার্ডের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলেছে মেয়েটা। তবে অবাক হয়ে আরেকটা মনিটরে দেখতে পেলো ওই লম্বুর লোকেরাও যাচ্ছে মেয়েটার পিছু পিছু। তারচেয়ে অবাক করার মতো ব্যাপার ওর সাথে ধাক্কা লাগা ক্যাপ-ওয়ালাকেও নিচের ফ্লোরের একটা মনিটরে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেলো। পরমুহূর্তেই সে গায়েব হয়ে গেল মনিটর থেকে।

তার মানে, খেলা জমে উঠেছে। তানভীর মনিটরের অপজিট দেয়ালে হাসপাতালের একটা ম্যাপ দেখতে পেয়ে মেয়েটার সম্ভাব্য অবস্থান বুঝে নিলো। মেয়েটা সম্ভবত হাসপাতালের পেছনের গেট দিয়ে পালানোর কথা

চিন্তা করছে। সে বিপদে পড়তে যাচ্ছে। কারণ হাসপাতালের পেছনের দিকেও ওই লম্বুর লোকের পাহারা আছে। হাসপাতালের ভেতরেও মেয়েটার পেছনে লোক লেগে আছে, যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকেও লোক অপেক্ষা করছে, মেয়েটা ফাঁদে আটকা পড়তে যাচ্ছে।

তানভীর দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ও দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবতে লাগলো, একটা ব্যাপার ওর কাছে পরিস্কার হচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটাতে ক্যাপ-ওয়ালার ভূমিকা কি? লোকটাকে ওর লম্বুর দলের লোক মনে হয়নি, আবার ঠিক...

কী ব্যাপার, ও কি আবারও ভুল পথে চলে এলো নাকি? নিচে নামার জন্যে ম্যাপে সিঁড়ির সম্ভাব্য অবস্থান দেখে নিয়েছিলো। এখন সিঁড়িটা খুঁজে পাচ্ছে না। ওই তো, দেখা যাচ্ছে। এই সিঁড়ি দিয়ে দুই ফ্লোর নিচে নামলেই বারান্দার এক কোনে নামা যাবে। ম্যাপে তাই দেখেছিলো। ও হাতে পিস্তলটা বের করে নিলো, যেকোন পরিস্থিতি যাতে সামলাতে পারে।

দৌড়ে এক সিঁড়ি নামার সাথে সাথেই থেমে গেল ও। ফোন বাজছে। নম্বর দেখে বুঝলো ওর সিনিয়র অফিসার ওয়াজেদস্যার ফোন করেছে। কলটা রিসিভ করে কথা বলতে বলতে নিচে নামছিলো সে, হঠাৎ একটু সচেতন হয়ে উঠলো। দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় কি ও কাউকে দেখলো, নাকি মনের ভুল। কেন জানি ওর মনে হলো কেউ একজন উঠে আসতে আসতে ওকে দেখে থেমে আবার উল্টো নেমে গেল। কেন ওর এরকম মনে হলো ও বলতে পারবে না কিন্তু মনে হবার সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠলো। ও এখনো মোবাইলে কথা বলতে বলতে নিচে নামছে, তবে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বসকে বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে সোজা বারান্দায় চলে এলো।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের বারান্দায় প্রবেশ করামাত্র আরেকটু হলেই ওর হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে যাচ্ছিলো। এভাবে বোকার মতো তেমন কোন প্রস্তুতি ছাড়া এখানে ঢোকার কারণে নিজেকে গালি দিলো। একদল লোক- একদল বললে আসলে বেশি বলা হয়। ওই লম্বু আর ওর সাথে একজন, অন্যটাকে দেখা গেল না। ওরা পাগলের মতো এদিকে ছুটে আসছিলো। কোন না কোন কারণে ওকে দেখে থমকে দাঁড়ালা। ওকে দেখে লম্বু থেমে

যেতেই বাকি দু-জনও দাঁড়িয়ে গেল।

তানভীর যেমন ওদেরকে দেখে চমকে উঠেছে ঠিক একইভাবে ওরাও পিস্তল হাতে একজনকে আসতে দেখে দেখে চমকে উঠলো। ওদের আগে তানভীরই চমক সামলে নিলো। লম্বুর দুই স্যাঙ্গাতের হাতেই অস্ত্র দেখে ও সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কী করতে হবে। পিস্তলটা হাতে বের করাই ছিলো, স্রেফ উঁচু করে গুলি করে দিলো। নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে ও গুলি করেনি বরং গুলি করেছে ওদের তিনজনের মাঝামাঝি তাক করে। সাথে সাথে লম্বু আর ওর তিন সাগরেদ লাফিয়ে পড়লো তিনদিকে। তানভীর নিজেও লাফিয়ে একটা রোগি টানার স্টিলের ট্রলি নিয়ে একপাশে কাত হয়ে পড়লো। ও নিজেকে ট্রলিটার স্টিল বডি দিয়ে আড়াল করলো। সাথে সাথে ওর আশেপাশে বোলতার মতো এসে বিঁধলো কয়েকটা বুলেট। টেবিলের আড়াল থেকে স্রেফ হাত উঁচু করে টানা কয়েকটা গুলি করলো ও। ওর গুলিতে কোন শব্দ হচ্ছে না, কারণ সাইলেন্সার লাগানো কিন্তু লম্বুর দলের পিস্তলের শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো হাসপাতাল। তানভীর টেবিলের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো লম্বু আর ওর দলের কে কোথায় আছে। কিন্তু উঁকি দিতেই আবারো বুলেট এসে লাগলো। আবারো শুধু হাত তুলে গুলি করলো ওদের দিকে।

ও গুলি করার সময়ে আবারো দুটো গুলি এসে লাগলো। হাতের কব্জিতে ছ্যাঁকা অনুভব করলো ও। বুঝলো ওরা ওৎ পেতে আছে। স্রেফ একটু সুযোগ পেলেই গুলি করে দেবে। লম্বুকে দেখে ওর গাধা মনে হয়েছিলো কিন্তু মোটেই সে তা নয়। তানভীর বুঝতে পারলো প্রথমে ওদেরকে চমকে দিতে পারলেও এখানে গোলাগুলি করে ও কিছুতেই সুবিধা করতে পারবে না, কারণ এরা সবাই অভিজ্ঞ। তারচেয়ে এখান থকে পালাতে হবে। ও লাফিয়ে পড়ার আগে বারান্দার এক কোনে কয়েকটা অক্সিজেনের সিলিন্ডার দেখেছিলো। ওগুলোকে কাজে লাগাতে পারবে কিন্তু তার আগে ডাইভার্শন তৈরি করতে হবে।

তানভীর মুহর্তের ভেতরে করণীয় ঠিক করে ফেললো। যে-টেবিলের আড়ালে লুকিয়ে আছে ওটার পেছনে কয়েকটা ককশিটের মতো দেখতে কীসের যেনো প্যাকেট আছে। ও দুটো প্যাকেট একসাথে তুলে ধরে ছুঁড়ে মারলো শূণ্যে, প্যাকেট দুটো শূণ্যে থাকা অবস্থাতেই গুলি করলো ও

দুটোতে। দুটো প্যাকেটেরই ভেতরে তরল কিছু একটা ছিলো। ওগুলো আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লো বৃষ্টির মতো। সাথে সাথে তানভীর টেবিলের আড়াল থেকে বের হয়ে মেঝেতে দুটো গড়ান দিয়ে নিজেকে মেঝেতে স্থির করে যেখানে সিলিন্ডারগুলো দেখেছিলো সেদিকে তাক করলো পিস্তলটা। এক সেকেন্ডের ভেতরে একটা সিলিন্ডারের মুখের ক্যাপে নিশানা করে ট্রিগার টিপে দিলো।

পরিপূর্ণ বাতাস ভরা বেলুনের মুখ হঠাৎ খুলে দিলে বেলুনটা যেভাবে পাগলের মতো এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে, সিলিন্ডারটার অবস্থা হলো অনেকটা ওরকম। দেড়-ফুটি সিলিন্ডারটা প্রথমে মেঝে ধরে একদিকে ছুটলো তারপর উঠে গেল শূণ্যে। বারান্দার গ্রিলের ফাঁকে আটকে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো বোমার মতো।

অক্সিজেনের হিসহিস শব্দের ভেতর দিয়ে পাগলের মতো উল্টোদিকে ছুটলো তানভীর। মোটকুর দলের লোকজনের অবস্থা ভাবার মতো সময় নেই। ও ছুটতে ছুটতে একেবারে হাসপাতালের সামনে চলে এলো। সেই রিসেপশনের সামনে এসে হাটুতে ভর দিয়ে দম নিলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার পিস্তলটা হাতে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো সামনের অংশে। এখানে এসে দেখলো এদিকে আরেক নাটক চলছে। সেই ক্যাপওয়ালা–যদিও এখন তার মাথায় আর ক্যাপ নেই–আর মেয়েটা ফায়ার-এস্কেপের প্যাচানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে আর এক লোক নিচ থেকে গুলি করছে ওদের। ও তাকাতেই হঠাৎ দেখলো সিঁড়ির ওপর থেকে ক্যাপওয়ালা নিচের লোকটার ওপরে লাফিয়ে পড়লো।

ও ঝেড়ে দৌড় দিলো ওদিকে, পৌছাতেই দেখতে পেলো মেয়েটার হাত ধরে বাউন্ডারির দিকে দৌড়াচ্ছে ক্যাপওয়ালা। আর হাসপাতালের পেছন দিক থেকে দৌড়ে আসছে লম্বু আর ওর সঙ্গি। ও এতোটুকু দ্বিধা না করে ওদের দিকে পিস্তল তুলে দুটো গুলি করলো। সাথে সাথে আবার ওরা ছড়িয়ে পড়লো বাগানের ভেতরে। যে যেদিকে পারলো বিভিন্ন দিকে লাফিয়ে পড়লো।

তানভীর দেখলো ওই দু-জন ইতিমধ্যেই দেয়াল টপকে বের হয়ে গেছে।

ও দেয়ালের দিকে না গিয়ে গেটের দিকেই দৌড় দিলো। গেট দিয়ে

বেরিয়েই দেখে দু-জনে একটা গাড়িত উঠছে। ব্লু-টুথে মিঠুকে এদিকে আসতে বলে সোজা দৌড় দিলো গাড়ির দিকে। ও কাছাকাছি পৌছাতে পৌছাতে গাড়িটা স্টার্ট হয়ে চলতে শুরু করলো। হাল না ছেড়ে অনেকটা ঝোঁকের বশেই দৌড়াতে থাকলো। আসলে নিজেও জানে এভাবে দৌড়ানোর কোন মানে হয় না। দৌড়াতে দৌড়াতে অনেকটা এগিয়ে দম হারিয়ে থেমে গেল ও। গাড়িটা ফুল স্পিডে চলতে শুরু করেছে।

ও হাটুতে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে, ঘ্যাঁচ করে সাদা জিপটা এসে ওর পাশে থামলো। ড্রাইভিং সিটে মিঠু।

মিঠুকে সরতে বলে লাফিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়লো ও। উঠে বসেই জিপ ছোটালো তীব্র গতিতে।

"আস্তে, ভাই," মিঠু জিপের সিট আঁকড়ে ধরলো হঠাৎ স্পিডের ঝোঁক সামলানোর জন্যে। "হাসপাতালের ভেতরে বেশ একটা অ্যাকশন হয়ে গেল মনে হয়?"

"ঝামেলা বেঁধে গেছে। ওই মেয়েটার কাছে এখন জাফর সাদেকের সমস্ত তথ্য। মেয়েটাকে কোন থার্ড পার্টি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এখুনি থামাতে না পারলে মেয়েটাও মরবে প্লাস আমাদেরও বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।"

তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে হাইওয়েতে উঠে এলো ওদের জিপ।

"ধুর!" হাইওয়েতে উঠেই হতাশার সাথে চিৎকার করে উঠলো তানভীর। হাইওয়ে একেবারে খালি। কয়েকটা ট্রাক আসছে যাচ্ছে। ওই গাড়িটার কোন চিহ্নও নেই। "এখন কি করবো? ওদের গাড়ির তো ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি হেল্প করছি," জিপের পেছন থেকে নিজের ব্যাকপ্যাকটা টেনে নিয়ে ওপেন করলো মিঠু। "এখানে সব সেট করা আছে। ট্র্যাক করতে কয়েক মিনিট লাগবে। আমাকে স্রেফ একটা নম্বর দাও। গাড়ির নম্বর, মোবাইল বা অন্যকিছু।"

"কোন নম্বর তো নেই।"

"নো প্রবলেম," মিঠু একদম শান্ত আছে। "আচ্ছা, মেয়ে বা ছেলে কারো নম্বরই নেই?"

"না।"

"ঠিক আছে, দেখছি," বলে সে ল্যাপটপে কিছু টাইপ করতে লাগলো।

তানভীর আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে, মনের কোনে আশা, যদি ওই গাড়িটাকে চোখে পড়ে।

"মেয়েটার নাম বলো।"

"তুলি।"

"আরে, সম্পূর্ণ নাম বলো। নামের আগে-পিছে কিছু নেই?"

"আমি তো জানি না। শুধু এই নামটাই জানি।"

"আচ্ছা দেখি," বলে সে কাজ করতে লাগলো। "পেয়েছি, দেখো তো এই মেয়েটাই কিনা?" বলে সে ল্যাপটপটা তানভীরের সামনে তুলে ধরলে সে দেখলো হাসপাতালের ওয়েবসাইটে সব ডাক্তারদের প্রোফাইল যেখানে দেয়া থাকে সেখানে একটা মেয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে। নাম লেখা–সাবিকুন্নাহার তুলি।

"মনে তো হচ্ছে, তবে পুরোপুরি শিওর হতে পারছি না। চেক করে দেখ।"

"হুম...এটাই। ইমার্জেন্সি ডিউটিতে এরই নাম লেখা। মেয়েটার নম্বরও পেয়েছি, এখন দোয়া করো যাতে মোবাইলটা অন থাকে," বলে সে কাজ করে যেতে লাগলো।

"নম্বর কিভাবে পেলি?"

"ওই হাসপাতালের ওয়েবসাইটে রানিং ডক্টর আর ইন্টার্নদের লিস্ট ঘেটে প্রথমে ওকে বের করেছি, তারপর ওর প্রোফাইলে ক্লিক করতেই দেখি ইনফোতে নম্বর দেয়া আছে। এখন কথা হলো, এই নম্বরটা অ্যাকটিভ আর মোবাইলটা ওপেন থাকলেই বের করে ফেলবো।"

"পাওয়া গেছে," মিঠু রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলো। "এই যে।"

তানভীর গলা বাড়িয়ে মিঠুর ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রাখতেই দেখতে পেলো চট্টগ্রাম শহরের একটা ডিটেইল ম্যাপের এক জায়গায় একটা জ্বলজ্বলে বিন্দু বিপ্ করছে। তানভীর মনোযোগ দিয়ে অবস্থানটা দেখতে লাগলো।

"কাছেই আছে, এখান থেকে বড়জোড় এক মাইল হবে," বলে ও জিপটা ঘুরিয়ে ওদিকে রওনা দিলো। "এখান থেকে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে। ওটা ধরে গেলে কয়েক মিনিট লাগবে। তুই ল্যাপটপে ম্যাপটা আমার দিকে ধরে রাখ। আর হেডকোয়ার্টারকে কন্ট্যাক্ট করে সব জানিয়ে

দে, আমাদের সম্ভাব্য অবস্থানসহ।"

তানভীর জিপটা ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট রুটের দিকে ঠিক করে সর্বোচ্চ স্পিড তুলে দিলো। কিছুক্ষণের ভেতরেই শার্টকাট ধরে ওদের জিপ চলে এলো নির্দিষ্ট রাস্তায় একটা গলির ভেতরে। ওই গাড়িটা এখনো আসেনি। একটু পরেই ওটা ওদেরকে ক্রশ করবে।

মিঠু জানতে চাইলো, "কি করবে? ব্যাক-আপ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, নাকি ফলো করতে থাকবে?"

"দুটোর কোনটাই করবো না, দেখ কী করি," তানভীর ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মিনিটখানেকের ভেতরেই গাড়িটা ওদের সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাবে। তানভীর স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। ওখানে এখন ওই গাড়িটার হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। "আসছে, আসছে..."

"আরে, তুমি কি পাগল হলে নাকি! আর একটু অপে..." মিঠু কথা শেষ করার আগেই তানভীর এক্সেলেটরে চাপ দিতেই ওদের জিপ অন্ধকার গলির ভেতর থেকে বাঘের মতো লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

অন্যদিক থেকে গাড়িটা আসছিলো মধ্যম গতিতে, হঠাৎ বেরিয়ে আসা জিপের ধাক্কা সামলানোর কোন উপায় রইলো না ওটার। জিপটা সোজা গিয়ে বাড়ি মারলো ওটার নাকে। সাথে সাথে গাড়িটা একশ ষাট ডিগ্রির মতো ঘুরে গিয়ে বাড়ি খেলো রাস্তার মাঝখানের আইল্যান্ডে। বাড়ি খেয়ে ওটার একটা অংশ ওদের জিপে লেগে একপাশে কাত হয়ে উল্টে স্থির হয়ে গেল। ওই গাড়িটার ঠিক পেছনেই আসছিলো একটা বাইক, গাড়িটা বাড়ি খেয়ে উল্টে যেতেই ওটাও নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। সোজা এসে গাড়ির পেছনে বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লো। বাইক একদিকে, অরোহী অন্যদিকে।

বাড়ি লাগার সাথে সাথেই ওদের জিপ অনেকটা ঘুরে গেল, সেইসাথে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনের স্টার্ট।

"তুই ঠিক আছিস?" মিঠুর কাঁধে একটা হাত রেখে জানতে চাইলো তানভীর।

"তোমার মতো পাগলের সাথে থাকলে আবার ঠিক!" মিঠু কোঁকাতে কোঁকাতে বলল।

তানভীর পিস্তলটা বের করে এক হাতে নিয়ে নেমে এলো জিপ থেকে। আগে মেয়েটাকে নিরাপদ করতে হবে। দেখতে পেলো উল্টে যাওয়া গাড়িটার অপরপাশে কেউ একজন নড়াচড়া করছে। তানভীর দ্রুতপায়ে গাড়িটার উল্টোদিকে এগোল, দেখতে পেলো মেয়েটা মাটিতে কাত হয়ে পড়ে আছে।

শিট! মনে মনে গাল দিয়ে দৌড় দিলো মেয়েটার দিকে। উল্টো হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটার কাঁধে একটা হাত রাখলো ওকে সোজা করার জন্যে।

সাথে সাথে মেয়েটা ঝটকা মেরে সোজা হয়ে গেল, তার হাতে দেখা যাচ্ছে কালো রঙের একটা পিস্তল, সেটার নল ওর দিকে তাক করা। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কের সাথে তানভীর অনুভব করলো ও যাকে বাঁচাতে এসেছে সে-ই ওকে গুলি করতে যাচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে সম্মোহিতের মতো পিস্তলের কালো নলটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

ও স্তব্ধ হয়ে গেলেও ওর ট্রেনিং পাওয়া মস্তিষ্ক ঠিকই সক্রিয় হয়ে উঠলো। গুলিটা বেরিয়ে আসার ঠিক আগমুহূর্তে মেয়েটার হাতে থাবা মারলো বাম হাতে।

খুব কাছে হঠাৎ বাজ পড়লে যেরকম নিজেকে বধির মনে হয় তানভীরের ঠিক একই অনুভূতি হলো। গুলিটা ওর কানের এতো কাছ দিয়ে গেছে যে কানে তালা লেগে গেল। ধাক্কার তীব্রতায় আরেকটু হলে বসেই পড়তো রাস্তার ওপরে। দ্রুত দুবার মাথা ঝাড়া দিয়ে কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে দেখলো মেয়েটা একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার হাতের পিস্তলটা ওর দিকে তাক করা।

"আরে, আপনি পাগল নাকি, আমি আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি আর আপনি কিনা আরেকটু হলে," তানভীরও চট করে পিস্তল তুললো মেয়েটার দিকে। "ইজি, ম্যাডাম ইজি," ওর এক হাতে পিস্তল, অপর হাতটা তুলে রেখেছে মেয়েটাকে শান্ত করার ভঙ্গিতে।

"কে আপনি? আমাকে মারতে চাইছেন কেন?" মেয়েটা পিস্তল তাক করে রেখেই মরিয়া স্বরে চিৎকার করে জানতে চাইলো।

"ইজি ম্যাডাম," তানভীর আবারো বলল। মেয়েটা যেরকম উত্তেজিত হয়ে আছে তাতে যেকোন সময় উল্টাপাল্টা কিছু একটা করে ফেলতে পারে। "আমি আপনাকে খুন করতে আসিনি বরং আপনাকে বাঁচাতে

চাইছি। আমি পুলিশের লোক, স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার।"

"আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না," মেয়েটা কাঁপা হাতে পিস্তলটা তাক করে বলল। "পুলিশ অফিসার ওই লোকটা, যে আমাকে ওই খুনিগুলোর কাছ থেকে উদ্ধার করেছে," একটু থেমে বলল, "তোমাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে।"

"ট্রাস্ট মি, ম্যাডাম। আমি সত্যি বলছি। আপনি পিস্তলটা নামান, আমরা কথা বলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি," মেয়েটার হাত যেভাবে কাঁপছে তাকে যেকোন সময় কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। "আপনি পিস্তলটা নামান, আমি আমার আইডি আর ব্যাজ বের করে দেখাচ্ছি।"

তানভীর কথাটা বলে ধীরে ধীরে নিজের পিস্তলটা নামিয়ে নিতে লাগলো, অপর হাতটা প্যান্টের পেছনে নিয়ে যাচ্ছে আইডি বের করার জন্যে। মেয়েটাকেও একটু নরম দেখালো, সে-ও নিজের পিস্তলটা নামিয়ে নিয়েছে অনেকটা।

"খবরদার! তুলি, এ-লোকটা ফ্রড," গাড়ির ওপাশ থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো।

তানভীর পিস্তলটা নামিয়ে নিচ্ছিলো ঝট করে সেটা আবার তুলে ফেললো। গাড়ির ওপাশ থেকে রক্তাক্ত একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। একটা হাতে ধরে রেখেছে পিস্তল। তানভীর সোজা তার দিকে তাক করলো পিস্তলটা। মেয়েটাও আবার ওর পিস্তল তুললো।

ওই লোকটার হাতের একটা জিনিস ওর দিকে তুলে ধরেছে।

তিনজনে তিনজনের দিকে পিস্তল তাক করে ধরলো একসাথে।

উদ্ধার

তানভীর, আফসার আর তুলি পিস্তল তাক করে আছে একে অপরের দিকে। তবে ওদের পিস্তল তাক করার অ্যাঙ্গেলে একটু পার্থক্য আছে।

আফসার দাঁড়িয়ে আছে উল্টে যাওয়া গাড়ির অন্যপাশে–তার মুখের একটা পাশ রক্তাক্ত হয়ে যওয়াতে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে–সে গাড়ির ওপর থেকে পিস্তল তাক করে আছে তানভীরের দিকে। তানভীরের পিস্তল সোজা আফসারের দিকে, আর তুলি বিভ্রান্ত হয়ে ওদের দু-জনার মাঝ বরাবর ধরে আছে পিস্তলটা, সে বুঝতে পারছে না কার দিকে তাক করবে।

"মিস তুলি, সাবধান। আপনি আমার কথা শুনুন, আমার আইডি আর ব্যাজ পেছনের পকেটে আছে। আমি সেটা দেখাচ্ছি," বলে ও একটা হাত তুলে আফসারকে দেখালো। "এই লোকটা যদি পুলিশ হয়ে থাকে ওকেও সেটা করতে বলুন।"

তুলি কিছু বলার আগেই তানভীরের দিকে ফিরে আফসার বলে উঠলো, "আমাকে ওরকম কিছু করতে হবে না। কারণ আমি ইতিমধ্যেই উনাকে প্রণে বাঁচিয়েছি। তুলি, এই লোকটা ফ্রড, আমার মনে হয় কেউ একে ভাড়া করেছে..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, প্রমাণ হয়ে যাবে," তানভীর মরিয়া হয়ে বলে উঠলো। "কিছুক্ষণের ভেতরেই পুলিশের ব্যাক-আপ চলে আসছে। তখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে সব?"

"ভুয়া কথা বলছে, এই লোক। তুলি, আমার মনে হয় কিছুক্ষণের ভেতরেই এর দলের লোকজন এখানে চলে আসবে, আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়া উচিত। না-হলে এর দলের লোকজনের হাতে ধরা পড়তে হবে।"

তুলি কনফিউজড হয়ে তাকিয়ে আছে। ওর পিস্তলটা এখনো দু-জনার মাঝামাঝি তাক করা।

"আমাদের মনে হয় আমরা বিপদে পড়তে যাচ্ছি এর দলের লোক যেকোন সময়..." আফসার কথা শেষ করার আগেই দূর থেকে পুলিশের

সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল।

সাথে সাথে মুখে হাসি খেলে গেল তানভীরের। সে আনন্দের সাথে বলে উঠলো, "এবার দেখা যাবে।"

ঠিক যেভাবে তানভীরের মুখে হাসি খেলে গেল সেভাবেই অন্ধকার হয়ে গেল আফসারের মুখ। সাইরেনের শব্দটা শোনামাত্রই সে নড়ে উঠলো। অদৃশ্য কারো উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ইশারা করতেই একটা বাইক স্টার্ট হলো। আফসার ওদের দিকে একটা গুলি ছুড়েই লাফিয়ে পড়লো রাস্তার আইল্যান্ডের মাঝ বরাবর। শরীরটাকে আইল্যান্ডের মাঝখানে গড়িয়ে দিয়ে অন্যপাশের রাস্তায় ল্যান্ড করার সাথে সাথেই সেই বাইকটা এসে থামলো আফসারের পাশে, ওটার পড়ে যাওয়া আরোহী গন্ডগোলের সময় কখন ওটাকে সরিয়ে ফেলেছে কেউ খেয়াল করেনি। বাইকটা থামতেই একলাফে পেছনে উঠে বসলো আফসার। সাথে সাথে ফুল স্পিডে বাইক ছেড়ে দিলো ওর সাগরেদ। এ-লোকটাই অ্যাক্সিডেন্ট করে বাইক নিয়ে পড়ে গেছিলো। অ্যাক্সিডেন্টের ঝোঁকটা সামলে ওঠার পর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলো আর অপেক্ষা করছিলো আফসারের ইশারার।

অন্যদিকে আফসারকে নড়তে দেখেই তানভীর তুলিকে এক হাতে ধরে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে, গুলিটা চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। নিজের শরীর দিয়ে তুলিকে আড়াল করে টেনে নিয়ে এলো একপাশে। আর কোন গুলি হলো না। একটা বাইক চলে যাবার শব্দ শোনা যেতেই তানভীর উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে পার হলো উল্টে থাকা গাড়িটা। পিস্তল হাতে আইল্যান্ডের অন্যপাশে ও যখন পৌছালো ততোক্ষণে বাইক অনেকদূর চলে গেছে। পিস্তল তুলেও নামিয়ে নিলো ও, এতোদূর থেকে কিছু করা সম্ভব নয়।

ও ফিরে এসে দেখলো মেয়েটা উল্টে থাকা গাড়িটার সামনে হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে, বন্ধ চোখের নিচ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে তার। তানভীর ওর সামনে হাটু গেড়ে বসে নরম সুরে জানতে চাইলো, "আপনি ঠিক আছেন?"

তুলি কোন জবাব দিলো না। একটু পরে প্রায় কয়েকটা পুলিশের গাড়ি আর জিপ এসে ঘিরে ফেললো জায়গাটাকে।

***

পনেরো বিশ মিনিট পর ওদের জিপের পেছনে এসে দাঁড়ালো তানভীর। "আমাদের এখন যেতে হবে," জিপের পেছনের খোলা বনেটের কাছে এসে ওখানে বসে থাকা মানুষটাকে উদ্দেশ্য করে বলল ও। জিপের খোলো বনেটের ভেতরের দিকে বসে আছে ডাক্তার মেয়েটা, জিপের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মিঠু।

একটু আগে লোকাল পুলিশ ফোর্স চলে আসার পর তানভীর ওদেরকে সব জানিয়ে জরুরি অ্যাকশন নিতে বলে। তবে ও অপেক্ষা করতে থাকে ওদের স্পেশাল ফোর্সের ব্যাক-আপ টিমের জন্যে। কারণ লোকাল ফোর্সকে ওর একবিন্দু বিশ্বাস নেই। ওদের ভেতরে স্থানিয় গডফাদারের লোক আছে। কাজেই কাকে বিশ্বাস করা যাবে, আর কাকে যাবে না সেটা বোঝা একেবারেই অসম্ভব।

ইতিমধ্যে তুলিকে মিঠুর জিম্মায় রেখে ও কাজগুলো সেরে আবার ফিরে এসেছে।

"মিস তুলি," মেয়েটা পানির বোতল হাতে স্থানুর মতো বসে ছিলো। ওর ডাকে চমকে উঠলো। "মিস তুলি, আমাদের স্পেশাল ফোর্সের গাড়ি চলে এসেছে। এখানে আমরা মোটেই নিরাপদ নই। যতো তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের সেফ-হাউজে পৌছাবো ততোই ভালো। কারণ আপাতত নিরাপদ হলেও আবার কখন আক্রমণ হয় কেউ বলতে পারবে না," এই পর্যন্ত বলে ও মাথাটা নিচু করে বলল। "স্থানিয় পুলিশকে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। চলুন।"

মেয়েটা কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালো। ওরা উঠতেই তানভীর জিপ ছেড়ে দিলো। ওদের জিপের সামনে আর পেছনে দুদিকেই একটা একটা করে স্পেশাল ফোর্সের গাড়ি।

তুলি খুব করুণ মুখে বসে ছিলো, হঠাৎ হেসে উঠলো।

"কি ব্যাপার, হাসলেন যে?" তানভীর জানতে চাইলো।

"এই বিপদের মাঝেও একটা ব্যাপার চিন্তা করে হাসি পাচ্ছে।"

"কি সেটা?"

"এই যে এতোগুলো গাড়ি, এতো আয়োজন, সব আমাকে ঘিরে। ব্যাপারটা ভাবতেই কেন জানি নিজেকে ভিআইপি ম নে হচ্ছে। যদিও সেটা খুবই হাস্যকর।"

তানভীর কিছু না বলে স্রেফ মাথা নাড়লো। পেছনের সিট থেকে সামান্য হেসে উঠলো মিঠু।

"আমার বাবা বলতেন, খুব সাধারণ মানুষও যেকোন সময় অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। নিজেকে তাই মনে হচ্ছে। অসাধারণ আর অসহায় এক মেয়ে।"

"মিস তুলি, বুঝতে পারছি আপনি প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছেন। বাট বিলিভ মি, একবার আমরা সেফহাউজে পৌছাতে পারলে আর কোন ঝামেলা থাকবে না।"

"সেটা আমার ব্যাপার না। আমার প্রশ্ন হলো, কেন সবাই আমার পেছনে লেগেছে। আমার কাছে এরা সবাই কী চায়? এরা কারা?"

"আপনি সব প্রশ্নের জবাবই জানতে পারবেন। আমরা একবার সেফহাউজে পৌছাই, আপনাকে সব জানানো হবে...বিস্তারিত জানানো হবে।"

তুলি আর কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলো।

পরিকল্পনা

আরো আধঘন্টা পরে ওদের তিনটে গাড়িই শহরতলীর একটা খামার বাড়ির মতো দেখতে বিরাট বাড়ির মেইন গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। গাড়িগুলো থামতেই গেটের মাঝের অংশে একটা ছোট্ট ফোকর দেখা গেল। তানভীর জিপের জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে কিছু একটা বলার একটু পরেই খুলো গেল বিরাট গেটটা। তিনটে গাড়িই বাড়িটার বিরাট আঙিনায় গিয়ে থামলো এক সাড়িতে।

ওরা সবাই নেমে আসার পর স্পেশাল ফোর্সের অফিসারদেরেকে বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে মিঠু আর তুলিকে নিয়ে ভেতরে চলে এলো তানভীর।

তুলি অবাক হয়ে দেখলো খুবই সুন্দর করে সাজানো-গোছানো বাড়িটা। কোন আইন প্রয়োগকারি সংস্থার অফিসের মতো নয় বরং অভিজাত কোন খামার বাড়ির মতো দেখতে অনেকটা।

"আপনি এখানে মিঠুর সাথে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি," বলে তানভীর ভেতরে চলে গেল।

তুলি লিভিং রুমটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। সুন্দর বেতের সোফা, সামনে চা-গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি সুন্দর টেবিল। দেয়ালে অনেক পেইন্টিং ঝোলানো। লিভিং রুমটাতে এমনকি একটা ফায়ার প্লেসও আছে। যদিও এখন সেটা বন্ধ।

তুলি অনুমান করলো নিঃসন্দেহে এটা কারো খামার বাড়িই হবে।

"আপনি সম্ভবত ভাবছেন এটা নিশ্চই কারো বাড়ি, তাই না?" মিঠু নামের ছেলেটা প্রশ্ন করলো পেছন থেকে।

তুলি কিছু না বলে ঘুরে তাকালো। "সে-রকমই তো মনে হচ্ছে।"

মিঠু ছেলেটা একটা সোফার হাতলে বসে আছে। "আসলেও এটা চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ির শখের খামার বাড়ি ছিলো। উনি আবার আমাদের বস, মানে, এই স্পেশাল ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াজেদস্যারের খুব ক্লোজ

ফ্রেন্ড ছিলেন। মারা যাবার আগে এই বাড়িটা আমাদের স্পেশাল ফোর্সকে উনি উইল করে দিয়ে যান। উনার ইচ্ছে ছিলো এই বাড়িটা ভালো কোন কাজে লাগুক। এরপর আমাদের বস এটাকে স্পেশাল ফোর্সের সেফ-হাউজ কাম লোকাল হেডকোয়ার্টার করেন। এখানে আমাদের অফিস আছে, কমিউনিকেশন রুম, স্পেশাল স্যাটেলাইট সেট-আপ, অফিসারদের টেম্পোরারি থাকার ব্যবস্থা, কিচেন–এমনকি পেছনে একটা সুইমিং পুল আর পেছনের গ্যারাজে একটা আসামি রাখার বন্দিশালা পর্যন্ত আছে।"

তুলি হেসে ফেললো, "আমাকে ওখানে বন্দি করে রাখার জন্যে আনেননি তো?"

ওর কথা শুনে মিঠু একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলো। "না না, কী যে বলেন!"

"মিস তুলি, আমাদের স্যার অপেক্ষা করছেন," তানভীর ফিরে এসে বলল। "উনি আপনার সাথে কথা বলবেন। আমার মনে হয় আপনার সব প্রশ্নের উত্তর উনিই সবচেয়ে ভালো দিতে পারবেন।"

তানভীরের পেছন পেছন হাটতে লাগলো তুলি। ওরা তিনজনে হাটতে হাটতে বেশ কয়েকটা রুম পার হয়ে এলো। চারপাশটা দেখতে দেখতে তুলির কাছে মনে হলো এ-বাড়িটার পুরোটাই এখন কেটে-ছেটে অফিস বানানো হয়েছে। ওরা একটা কনফারেন্স কাম অফিস রুমে চলে এলো।

এই রুমটা দেখে তুলির মতো হলো এটা সম্ভবত বাড়ির ডাইনিং রুম ছিলো। এটাকে পরিবর্তন করে এখন কনফারেন্স রুম করা হয়েছে। রুমটার একপাশে বেশ বড় একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে বসে একজন মানুষ কিছু কাগজপত্র চেক করছিলেন, তুলিকে দেখে উঠে এলেন। বেশ বয়স্ক একজন মানুষ, কমপক্ষে ষাট হবে। কিন্তু বয়সের তুলনায় একদম ফিট। পরনে সাধারণ পোলো শার্ট, গ্যাবাডিন প্যান্ট আর পায়ে লোফার। ভদ্রলোক ওর দিকে এগিয়ে এসে বেশ উচ্ছল ভঙ্গিতে স্বাগত জানালেন।

"আসুন আসুন, ডক্টর তুলি। আমি ওয়াজেদ আবদুল্লাহ। স্পেশাল ফোর্সের চিফ, এক্স পুলিশ অফিসার। আজ রাতে আপনাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে," কাছে আসার পর তুলি দেখতে পেলো লোকটার চুলগুলো সব রূপালি, মোমপালিশ করা গোঁফ জোড়াও তাই। "বসুন প্লিজ।

আপনি চাইলে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নিতে পারেন। এরপর আমরা বসতে পারি।"

"না না, আমি আগে পুরো ব্যাপারটা জানতে চাই," তুলি দৃঢ়তার সাথে বলল। একবার ঘড়ি দেখে নিলো ও। রাত বারোটা পার হয়েছে মাত্র। বেশি রাত হয়নি কিন্তু এরইমধ্যে এতো বেশি ঘটনা ঘটে গেছে যে, ওর কাছে মন হচ্ছে অনেক রাত হয়ে গেছে।

"সাবরিনা, তুমি ব্রিফ করো," কথাগুলো ওয়াজেদসাহেব একদম হ্যাংলা টি-শার্ট আর জিন্স পরা একটা মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন। মেয়েটার বার বার চোখ কচলানো দেখে তুলির মনে হলো তার প্রচন্ড ঘুম পেয়েছে। "আর মিঠু, তুমি সাবরিনাকে হেল্প করো।"

"স্যার, ওদের গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। আমি আপনার সাথে প্রাইভেটলি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম," ওয়াজেদসাহেবকে একপাশে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে লাগলো তানভীর।

তুলি চেয়ারে বসে মিঠু আর সাবরিনার প্রস্তুতি দেখছে। ওরা একপাশের দেয়ালে সেট করা বিরাট স্ক্রিনটার কানেকশন দিলো মিঠুর রঙবেরঙের স্টিকার লাগানো ল্যাপটপটাতে। দু-জনে মিলে কিছুক্ষণ ল্যাপটপে নিয়ে কাজ করে মিঠু ওর দিকে ফিরে বলল, "আমরা রেডি। স্যার এলেই শুরু করে দেবো।"

তুলি কিছু না বলে একটু হাসলো। রুমের এক কোণে একটা কফি মেশিন দেখে লোভি দৃষ্টিতে তাকালো ওটার দিকে। একটু কফি পেলে এখন জানটা জুড়িয়ে যেতো।

"সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, মিস তুলি," ওয়াজেদসাহেব আর তানভীর কথা শেষ করে ফিরে এসেছে। ওয়াজেদসাহেব তুলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "অপনার মনে হয় একটু কফি খাওয়া দরকার। রাইট? এই মিঠু, মিস তুলিকে কফি দাও," বলে দু-জনেই বসে গেল চেয়ার টেনে। এমন সময় রুমে আরো তিনজন এসে ঢুকলো, এর পরপরই আরো দু-জন। প্রথম তিনজনকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো স্পেশাল ফোর্সের অফিসার হিসেবে। আর পরের দু-জনার একজন ওয়াজেদসাহেবের সেক্রেটারি, অপরজন রেকর্ড কিপার।

"মিস তুলি, পুরো ব্যাপারটা জানানোর আগে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন আছে।"

"বলুন...ধন্যাবাদ," প্রথম শব্দটা ওয়াজেদসাহেবের উদ্দেশ্যে বলে দ্বিতীয়টা বলল মিঠুর উদ্দেশ্যে। এইমাত্র ওর হাতে কফির কাপটা ধরিয়ে দিয়েছে ছেলেটা। মেশিনের কফি কখনো না খেলেও কাপে চুমুক দেয়ার পর এই মুহূর্তে ওটাই তুলির অমৃত মনে হলো।

"আচ্ছা, আপনি কি ডন জাফর সাদেক, ওরফে সাদেক গুন্ডা নামে কাউকে চেনেন?"

"সাদেক গুন্ডাকে এই চট্টগ্রাম শহরের কে না চেনে? আমিও তাকে অতোটুকুই চিনি, সাধারণ যে কেউ তাকে যতোটা চেনে। তার সাথে আজ রাতের ঘটনার সম্পৃক্ততা আছে, তাই না?" তুলি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে জানতে চাইলো।

"সেটা পরে বলছি। আগে আমাদেরকে জাফর সাদেকের ব্যাপারে ব্রিফ করো সাবরিনা," ওয়াজেদসাহেব মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

"জাফর সাদেক," বলে সাবরিনা একটা ছবি ওপেন করলো। সেখানে সুদর্শন একজন মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে, হালকা পাক ধরা চুল-দাড়িতে তাকে আরো ব্যক্তিত্ববান মনে হচ্ছে। "ওরফে সাদেক গুন্ডা। চট্টগ্রামের কুখ্যাত গুন্ডা। যেকোন সিনেমার কাহিনীকে হার মানায় তার জীবনের গল্প। এই চট্টগ্রাম শহরের এক বস্তিতে জন্ম। ছোটবেলা থেকে চুরি-চামারি গুন্ডামি করে বড় হয়ে ওঠা, তারপরে পলিটিক্যাল ক্যাডারবাজি। এক রাজনৈতিক নেতার প্রশ্রয়ে সে বেড়ে উঠতে শুরু করে। ড্রাগ আর অস্ত্রই তার মূল ব্যবসা। এক সময়ে চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে বড় ত্রাস ছিলো সে। এরপর কোন এক কারণে এসব ছেড়ে দিয়ে ভালো হয়ে যায়। কেন সে খারাপ পথ ছেড়ে দেয় এসব নিয়ে অনেক গুজব আছে। কিন্তু কোনটাই প্রমাণিত নয়। শোনা যায়, সে এসব ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করে পুরোপুরি সংসারি হয়ে যায়। তার জীবনের এই সংসারের অংশটুকু, মানে, মাঝখানের প্রায় দশ পনেরো বছরের কোন রেকর্ড নেই। এর বহুবছর পর সে আবারো পুরনো পেশায় ফিরে আসে। কেন সে ফিরে আসে আবার পুরনো জীবনে এটাও সঠিকভাবে জানা নেই। কথিত আছে, তার পরিবারের সবাইকে পুরনো এক শত্রু খুন

করে ফেলায় সে উন্মাদ হয়ে আবারো এই জীবনে ফিরে আসে। এসে একররকম মাঠ দখল করে ফেলে। বিগত বিশ বছর যাবত সে চট্টগ্রাম শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিলো। আন্ডারওয়ার্ল্ডে তার নেটওয়ার্ক ছিলো বেশ শক্তিশালী। গত পাঁচবছরে সে দুবাই থেকেই অপারেট করে আসছিলো।

"বাংলাদেশ থেকে তাকে ধরার জন্যে বহুবার বহু স্টেপ নেয়া হলেও কোনটাতেই কাজ হয়নি। এরপর কিছুদিন আগে একটা সুযোগ পেয়ে স্পেশাল ফোর্সের অফিসার তানভীর এবং তার দলকে দুবাই পাঠানো হয় তাকে ধরার জন্যে," এ-টুকু বলে সে দুবাইয়ের সমস্ত ব্যাপারটা ডিটেইল জানালো। "...অফিসার তানভীর যখন তার টিম নিয়ে জাফর সাদেক পর্যন্ত পৌছে তখন সে মারা গেছে, তার সমস্ত ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক জিনিস নিয়ে তার রাইট হ্যান্ড মোস্তাক দুবাই ছেড়ে পালিয়েছে। ডন জাফর সাদেকের সমস্ত সম্পদের হদিস, সমস্ত গোপন নথি, তার বিস্তারিত নেটওয়ার্কের যাবতিয় ডিটেইল, তার সাথে অপারেট করতে থাকা সরকারি আর বে-সরকারি সবার লিস্ট ছিলো এই লোকের কাছে," বলে সে আরেকটা ছবি ওপেন করলো। "...এই লোকটাই আজ আহত অবস্থায় ডাক্তার তুলির তত্ত্বাবধানে চিকৎসা নেয়ার সময় মারা যায়। মারা যাবার আগে একমাত্র ডক্টর তুলির সাথে কথা বলেছে সে।"

তুলি দেখলো সাবরিনা নামের মেয়েটি সেই লোকের একটা ছবি ওপেন করলো।

"তার মানে, এ-জন্যেই এসব লোক আমার পিছে লেগেছে?" তুলি জানতে চাইলো।

"হ্যা," জবাবটা তানভীরের। "এরা কারা, আপনাকে সেটা দেখাচ্ছি," বলে সে ল্যাপটপের সামনে চলে এলো। "ওই লম্বুর দল হলো জাফর সাদেকের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বি, জাফর সাদেক মারা যাবার পর চট্টগ্রামের সবচেযে বড় ডন তালুকদার মোস্তাফিজের লোক," বলে সে একে একে ওদের টিমের সবার ছবি দেখালো। তার মানে, আমরা যেমন জানতে পেরেছিলাম মোস্তাক আগ্রাবাদে থাকবে ওরাও সেটা জানতো।"

"ওরা কিভাবে জানবে?" প্রশ্নটা অফিসারদের একজনের।

"উল্টোপথে।"

"মানে?"

"মানে, আমরা যেমন অন্ডারওয়ার্ল্ডে ইনফর্মার পুষি, ঠিক ওদেরও তেমনি লোকাল ফোর্স থেকে শুরু করে সবখানে ইনফর্মার আছে। আমাদের স্পেশাল ফোর্সেও আছে কিনা কে জানে," তানভীর একে একে সবার দিকে তাকালো।

"ঠিক আছে, আমরা আবার ব্রিফিঙে ফিরে যাবো," ওয়াজেদসাহেব অস্বস্তিটা কাটানোর জন্যে বললেন।

"ওই লোকটা কে? ওই বিড়াল-চোখের লোকটা, যে আমাকে হাসপাতাল থেকে বের হতে সাহায্য করেছিলো," তুলি জানতে চাইলো।

"কন্ট্রাক্ট কিলার। ওর পরিচয় পাওয়া গেছে," মিঠু একটা ছবি ওপেন করলো। যদিও ছবিটা একটু ঘোলা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। এটাই ওই লোক। "ওর নাম আফসার। চোখের কটা রঙের কারণে আন্ডারওয়ার্ল্ডে বিলাই আফসার নামে পরিচিত। তার আরেকটা নাম আছে, 'কর্পোরেট কিলার'। সে একেবারে কর্পোরেট স্টাইলে কন্ট্রাক্ট নিয়ে খুন করে। অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং ভয়ঙ্কর খুনি। আজ পর্যন্ত সে নাকি কোন খুনে ব্যর্থ হয়নি। কন্ট্রাক্ট কিলিঙের জগতে সবচেয়ে বেশি টাকা নেয় সে।"

"একে আমার পেছনে লাগালো কে?"

"এটা আমরা এখনো বের করতে পারিনি। তবে কিছু হাইপোথিসিস আছে, শিওর না যদিও। আমার মনে হয় জাফর সাদেকের শত্রুর তো আর অভাব ছিলো না, তাদেরই কেউ একজন একে নিয়োগ দিয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থে। আবার এমনটাও হতে পারে, এই ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে। কারণ সে নাকি এক সময় জাফর সাদেকের সাথে কাজ করতো।"

"তার মানে, এই মোস্তাফিজের গ্যাঙ...মানে, ওই লম্বুর খুনিরা, এই কটা চোখের খুনি আর কে কে আছে আল্লাহ জানে। এরা সবাই আমার পেছনে লেগেছে আর..." বলে একটু থামলো তুলি। "এক অর্থে বলতে গেলে আপনারাও...তাই না?"

"মিস তুলি, আমরা আপনাকে নিরাপদ করতে চাই," তানভীর বলল।

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা," ওয়াজেদসাহেব বললেন, "উত্তর

দেয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে উত্তর দেবেন। আর সত্যটাই বলবেন। কারণ এই উত্তরের ওপর আপনার জীবন নির্ভর করছে। মৃত মোস্তাকের সাথে আপনার কী কথা হয়েছিলো, সে আপনাকে কি বলেছে মারা যাবার আগে? সেই সাথে আমরা যা ভাবছি সেসব তথ্য কি সত্যি সত্যি সে আপনাকে বলে গেছে?"

সবার মুখ থমথমে, তাকিয়ে আছে তুলির দিকে।

তুলি সরাসরি ওয়াজেদসাহেবের চোখের দিকে তাকালো। "এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে, মি. ওয়াজেদ। আপনি ভেবে উত্তর দেবেন। আমি যদি আপনার এই প্রশ্নে উত্তর এখানে সবার সামনে দিয়ে দেই তাহলে আমার জীবনের আর মূল্য থাকে কি? সবাই আমার পেছনে লেগে আছে এই তথ্যটার জন্যেই। কিন্তু এরা কেউ আমাকে মারবে না এই তথ্যগুলোর কারণেই। আর যদি আমি সব বলে দেই তবে আমাকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?"

"আপনি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন না, মিস তুলি," কথাটা তানভীর বলল। "এরা আপনার পেছনে লেগেছে এই তথ্যগুলোর জন্যেই। আপনি আমাদের কাছে এ-তথ্যটা দিয়ে দিলে মুক্ত হয়ে যাবেন। আপনাকে আমরা প্রটেকশন দেবো। আর একবার আমাদের স্পেশাল ফোর্স এগুলো উদ্ধার করে ফেলতে পারলে আপনি এসবের বাইরে। আপনার আর কোন ঝামেলা থাকবে না।"

"ঠিক আছে, তাহলে আমাকে বলুন, পুলিশের ভেতরে যেমন এই আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজনের চর আছে তেমনি যদি স্পেশাল ফোর্সেও থেকে থাকে তবে আপনারা আমাকে কিভাবে প্রটেকশন দেবেন?"

সবাই চুপ। কারো কাছে এর জবাব নেই।

"মিস তুলি," ওয়াজেদসাহেব বললেন। "আমরা সবাই ব্যাপারটা সমাধান করতে চাই, তাই না?"

"হ্যা, এর সমাধানও আছে আমার কাছে," বলে তুলি দম নিলো। "ওই মোস্তাক নামের লোকটা মারা যাবার আগে সত্যি-সত্যি আমার সাথে কথা বলেছে। আপনারা এবং বাকি সবাই যা খুঁজছেন সেটার সন্ধান আমাকে সে দিয়ে গেছে, সেই সাথে আরো বেশি কিছু।"

"কিরকম সেটা?" তানভীর জানতে চাইলো।

"ওই ডন জাফর সাদেক গত বেশ কিছুদিন যাবত দেশে-বিদেশে তার বেশিরভাগ প্রোপার্টি বিক্রি করে তার সম্পদের বড় একটা অংশ ডায়মন্ডে কনভার্ট করে ফেলে। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিলো তার দিন শেষ হতে চলেছে। মনে হয় আপনারা দুবাইয়ে অপারেশন চালানোর সময়ের ঠিক আগে তার এ-সমস্ত ডায়মন্ড, তার সমস্ত প্রোপার্টির কাগজপত্র, তার নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে সবকিছু একসাথে করে এসব তার বিশ্বস্ত লোক মোস্তাকের হাতে তুলে দিয়ে এই দেশে তার পরিবারের শেষ সদস্যদের কাছে পৌছে দিতে বলে। মোস্তাক মনে হয় কাল রাতে আগ্রাবাদ এসেছিলো জাফর সাদেকের পরিবারের কারো সাথে দেখা করতেই। তাকে সে ওখানে পায়নি বরং ওখানে আসার পর তার ওপর আক্রমণ হয়, সে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে। এরপর তো আপনারা সব জানেনেই। আমি যা যা বললাম কিছুটা মোস্তাক আমাকে বলেছে বাকিটা কাল রাতের ঘটনা আর আপনাদের কাছ থেকে শুনে মিলিয়ে বললাম।"

"তাহলে এসব কোথায় রাখা আছে, আপনি জানেন?"

"হ্যা, জানি। কিন্তু আমি সেটা এভাবে বলবো না। কারণ এভাবে সবার সামনে বলে দিলে আমার প্রাণের আর কোন মূল্যই থাকবে না।"

"তাহলে আপনি কি চান?" ওয়াজেদসাহেব জানতে চাইলেন।

"আমি নিজে আপনাদের সাথে থেকে ওটা উদ্ধার করতে সাহায্য করবো, এরপর আপনারা সবকিছু যখন নিজেদের জিম্মায় নিয়ে নেবেন আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না, আমাকে কেউ খুঁজবেও না। তখন আমি চলে যাবো আমার ঠিকানায়।"

"ঠিক আছে, তাহলে পরিস্থিতি শান্ত হোক...আমরা একটা পরিকল্পনা করে..." তানভীরের কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিলো তুলি।

"যা করার আজ রাতেই করতে হবে। আপনাদের হাতে সময় নেই। আমাদের কারো হাতেই সময় নেই। যদি জিনিসগুলো উদ্ধার করতে চান তবে আজ রাতেই তা করতে হবে আর না-হয় কখনোই নয়।"

"কেন, আজ রাতেই কেন করতে হবে? পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে পরে করলে সমস্যা কি?"

"সমস্যা হলো, জিনিসগুলো আজ রাতে উদ্ধার করতে না পারলে আর কোনদিনই পারবেন না। ওগুলো উদ্ধার করার জন্যে আমাদের হাতে সময় আছে আর মাত্র পাঁচ-ছয় ঘন্টা। এরপর জিনিসগুলো আমরা চিরতরে হারাবো।"

"সেটা কিভাবে সম্ভব?"

"সম্ভব। কারণ," তুলি নাটকীয়ভাবে থামলো। "জিনিসগুলো আছে টোকিও মেরিন কোম্পানির একটা জাহাজে আর সেটা এই মুহূর্তে পতেঙ্গা বন্দরে আছে। ঠিক সকাল সাড়ে ছয়টায় পোর্ট ছেড়ে চলে যাবে সেটা।"

অভিযান

শাওয়ার সেরে নতুন পোশাক পরে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলো তুলি। সাবরিনা নামের সেই মেয়েটার পোশাক। তুলির পোশাকের অনেক জায়গায় ছিড়ে গেছিলো তাই ওটা পরিবর্তন করতে হয়েছে। তার আগে ওকে ফার্স্ট এইড দিয়ে গেছে একজন। পায়ে সমান্য ব্যথা পেয়েছিলো আর কপালসহ দুয়েক জায়গায় ছিলে গেছিলো। গুরুতর কিছু না। ফার্স্ট এইড দেয়াতে মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে।

আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে তুলি চিন্তা করলো, সাবরিনার পোশাকগুলো একটু বড়-বড় হয়েছে ওর তবে খারাপ লাগছে না। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতেই দরজায় নক হলো।

দরজা খুলে দেখলো তানভীর নামের সেই অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে এখন আর সেই চেক শার্ট নেঁই, সেটার পরিবর্তে ফুলহাতা কালো শার্ট পরেছে, সাথে নীল জিন্স।

"খাবার দেয়া হয়েছে, আপনি ডাইনিঙে চলে আসুন," তানভীর হাসিমুখে বলল।

লোকটা সুদর্শন হলেও হাসলে একটু বোকা বোকা দেখায়, তুলি মনে মনে ভাবলো।

"অভিযানের প্রস্তুতি কেমন? সময় তো খুব বেশি বাকি নেই," তাকে অনুসরণ করে হাটতে হাটতে তুলি জানতে চাইলো।

"সব প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে। আপনার খাওয়া হলেই আমরা ব্রিফ করে বেরিয়ে পড়বো।"

ডাইনিঙে আসতেই বাবুর্চি খাবার পরিবেশন করলো। খেতে খেতে কথা চললো।

তানভীর একটু দ্বিধার সাথে শুরু করলো, "মিস তুলি, আপনার জন্যে সত্যি আমার একটু খারাপ লাগছে। কোন দোষ না করেও স্রেফ ব্যাডলাকের কারনে এরকম বাজে একটা পরিস্থিতিতে ফেঁসে গেছেন। আমি প্রমিজ করছি, আমি থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।"

তুলি মৃদু হাসলো।

"আপনার বাড়িতে কে কে আছে?" তানভীর জানতে চাইলো।

"আপনি কি বলতে চান এখনো আপনারা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেননি?" তুলি একটু দৃঢ় স্বরেই জানতে চাইলো।

ওর কথা শুনে হেসে ফেললো তানভীর। "সরি সরি," বলে গম্ভীর হয়ে বলল, "বাবা-মা, ভাই সবাই মারা গেছে, একা থাকাটা খুব কষ্টের, তাই না? তার ওপর এরকম একটা ঝামেলা..."

"আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কতোটা কষ্টের।"

গম্ভীর পরিস্থিতিতেই খাওয়া শেষ করলো ওরা। এরপর চলে এলো সেই কনফারেন্স রুমে।

সেখানে রীতিমতো যুদ্ধের সাজে প্রস্তুত হয়ে আছে তিন অফিসার। ওয়াজেদসাহেব বসে কফি খাচ্ছেন। ওরা যেতেই ওদেরকেও কফি পরিবেশন করা হলো।

"ঠিক আছে, আমরা খুব সংক্ষেপে অপারেশনের বিস্তারিত ব্রিফ করে রওনা হবো। সময় খুবই কম," একজন অফিসার বলে উঠলো। "মি. তানভীর, আপনি শুরু করুন।"

"আমাদের অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য হবে এখান থেকে রওনা দিয়ে টোকিও মেরিন পর্যন্ত পৌছে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে মোস্তাকের রেখে যাওয়া প্যাকেটটা উদ্ধার করে আবার এখানে ফিরে আসা।

"আমাদের অপারেশনে অন-স্পটে থেকে যেকোন ধরনের আইটি সাপোর্ট দেবে মিঠু, এখানে অফিসে থাকবে সাবরিনা, টিমে যেকোন অবস্থায় আমাকে ব্যাক-আপ দেবে তিন অফিসার। আর পুরো অপারেশনের দায়িত্বে থাকছি আমি। টোকিও মেরিন জাহাজটা আছে পতেঙ্গা পোর্ট থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সমুদ্রের বুকে। আমরা এখান থেকে দুটো পাজেরো নিয়ে যাবো পতেঙ্গাতে। ওখানে বিচে আমাদের জন্যে স্পিড বোট থাকবে, ওটা দিয়ে জাহাজে যাবো। জাহাজের কাজ সেরে আবার সোজা এখানে চলে আসবো," বলে একটু থামলো ও।

"এরমধ্যে টোকিও মেরিনে যোগাযোগ করা হয়েছে মিস তুলির মাধ্যমে। উনার সাথে ক্যাপ্টেন দেখা করতে রাজি হয়েছেন। তার তরফ থেকে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হবে অন্য তরফ থেকে। প্রথম সমস্যা,

আমাদের পেছনে লোক লাগবে। অন্তত একাধিক দলের লাগার পরিস্কার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমরা এই অভিযান যথা সম্ভব কম লোককে জানিয়েছি। এখন মিস তুলি, আপনার কি বলার আছে বলুন। আপনি মোস্তাকের কাছ থেকে কি জেনেছেন?"

"মোস্তাক যতোটুকু আমাকে বলেছিল, টোকিও মেরিনের ক্যাপ্টেন সম্ভবত তার বসের খুবই প্রিয় বন্ধু ছিলো। সে তাই সবকিছু তার কাছে রেখেছে একমাত্র তাকেই সে বিশ্বসে করেছে, তার ধারনা ছিলো চট্টগ্রামের কোথাও সে এগুলো নিরাপদে রাখতে পারতো না। সে আমাকে একটা পাসওয়ার্ড বলেছে, ওটা বললেই ক্যাপ্টেন অমাকে জিনিসগুলো দিয়ে দেবে। জিনিসগুলো রাখা আছে একটা ব্যাগে। ব্যাগটা লক করা আছে, সেটার একটা কম্বিনেশনও মোস্তাক আমাকে বলে গেছে।"

"ঠিক আছে এই তাহলে পরিকল্পনা। বেস্ট অব লাক। লেটস গো।"

ওরা সবাই বাইরে এসে গাড়িতে উঠলো। অন্ধকারের ভেতরে দুটো কালো গাড়ি নিঃশব্দে ভুতের মতো চলতে লাগলো পতেঙ্গার উদ্দেশ্যে।

"আপনি চাইলে এটা পরে নিতে পারেন,"একটা ভেস্ট দেখিয়ে বলল। "আর আমি অন্য একটা জিনিসের ব্যবস্থা করেছি, এটাও রাখুন। কখন কি হবে কেউ বলতে পারে না," তানভীর একটা ছোট্ট গ্লক পিস্তল তুলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল।

তুলি ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পিস্তলটা নিয়ে ব্যাগে ভরে রাখলো। ফিরিয়ে দিলো ভেস্টটা।

"আপনারা এতো ভয় পাচ্ছেন কেন?" তুলি যেন একটু বিরক্ত।

"ব্যাপারটা ভয় নয়," তানভীর অস্বস্তির সাথে একটু নড়েচড়ে বসলো। "এই গ্যাংস্টাররা, মানে, এটা ওদের এলাকা। পলিটিশিয়ান, পুলিশ থেকে শুরু করে চায়ের দোকানদারদের ভেতরে পর্যন্ত এদের লোক আছে। এখানে আমরাই বহিরাগত। বাইরে থেকে এসে এদের ভেতরে ঢুকে এদের জিনিস ছিনিয়ে নেয়া কতোটা কঠিন তা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"একটা প্রশ্ন ছিলো," তুলি আনমনেই জানতে চাইলো।

"বলুন।"

"ওই জিনিসগুলো, মানে সমস্ত তথ্য, সম্পদ সব যদি আপনারা উদ্ধার করতে পারেন তবে সেগুলো নিয়ে কি করা হবে?"

"এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই। তবে তথ্যগুলো পেলে জাফর সাদেকের নেটওয়ার্ক পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব হবে। সেইসাথে ওর নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত অন্য গডফাদারদের নেটওয়ার্কও কব্জা করা যাবে। ওর সম্পদের ব্যাপারটা আমি জানি না। মনে হয় সরকার সেটা করায়ত্ত্ব করবে। ওগুলো নিয়ে যাই ঘটুক, এটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনার আর কোন সমস্যা হবে না।"

"ধন্যবাদ," কথাটা বলে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো তুলি।

আরো আধঘন্টা পরে গাড়ি দুটো থেমে গেল। ওরা নেমে এলো একে একে। শুধু মিঠু আর ড্রাইভার দু-জন রয়ে গেল গাড়িতে। ওরা খানিকটা হেটে চলে এলো পোর্টের একপাশে। সেখানে ওদের জন্যে স্পেশাল ফোর্সের ব্যবস্থা করা একটা স্পিড-বোট অপেক্ষা করছিলো। সবাই উঠে বসলো সেটাতে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ওদের স্পিডবোট চলে এলো টোকিও মেরিনের পাশে। জাহাজের অথরিটিকে আগে থেকেই জানানো ছিলো ওরা আসবে। স্পিড বোটটা ভিড়তেই জাহাজ থেকে ল্যাডার নামিয়ে দেয়া হলো ওপরে ওঠার জন্যে।

ল্যাডারে ওঠার আগে তুলি বলে উঠলো, "আমার মনে হয় আমি একা যাওয়াই ভালো, নইলে ওই লোক কিছু একটা সন্দেহ করতে পারে।"

"কিন্তু—" তানভীর কথা শেষ করার আগেই তুলি বলে উঠলো, "আমি না ফিরে এলে প্রয়োজনে আপনারা জাহাজে অভিযান চালাবেন। এটা জাহাজের অথরিটিও জানে, কাজেই এখানে কোন সমস্যা হবার কথা নয়।"

তুলি ল্যাডারে উঠে গেলে ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো। বিশ মিনিটের মাথায় ফিরে এলো সে। হাতে একটা স্টিলের ব্রিফকেস।

"উফ, শান্তি। আমি সত্যিই ভয়ে ছিলাম," তুলি ফিরে আসাতে তানভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। "কোন সমস্যা হয়নি তো?"

"নাহ। আমি গেলাম, ভদ্রলোক বেশ বয়স্ক, উনার সাথে দেখা হতেই বললাম আমাকে অমুকে পাঠিয়েছে। উনি আমাকে পাসওয়ার্ড বলতে বললেন, আমি বললাম। উনি এটা দিলেন। আমি বললাম ভেতরটা চেক করে দেখতে চাই। উনি বললেন, এই ব্রিফকেসে কী আছে উনি জানেন না।

এমনকি এটার লকের কম্বিনেশনও উনার জানা নেই। ওটা নাকি আমার জানার কথা। অমি আগেই বলেছি মোস্তাক আমাকে একটা কম্বিনেশন দিয়েছিলো, সেটাতে তিনটে নম্বর ছিলো। আমি সেই নম্বরটা কম্বিনেশনে সেট করতেই ব্রিফকেস খুলে গেল।"

"ভেতরে সব ঠিক আছে?"

"আমি ভেতরে শুধুমাত্র একটা বড় কালো প্যাকেট দেখেছি, মুখটা সিল করা। ওটা খুলে দেখিনি। আপনাদের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে এটা আমি মি. ওয়াজেদের হাতে তুলে দিলেই আমার মুক্তি।"

"ভেরি ফাইন," ওদের স্পিড বোট আবারো পোর্টের দিকে রওনা দিলো।

ওরা পোর্টে ফিরে বোট থেকে বিচে নেমে হেটে চলে এলো ওদের রেখে যাওয়া গাড়িগুলোর দিকে।

দুটো গাড়িই অন্ধকার ঝাউবনের পেছনে একেবারে ভুতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কাছে যাবার পরও কেউ এগিয়ে এলো না। ড্রাইভারেরাও গাড়ির দরজা খুললো না।

"সবাই সাবধান! কোন একটা সমস্যা হয়েছে," বলে তানভীর এগিয়ে গেল প্রথম গাড়িটার দিকে। ওর ঠিক পেছনেই তুলি। ওদের দু-পাশ এবং পেছনটা কভার করে আছে অফিসার তিনজন।

প্রথম গাড়ির কাছে গিয়ে ড্রাইভারের ঠিক পাশের দরজা ধরে টান দিতেই ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল ড্রাইভারের মৃতদেহ। তার ঠিক কপালের পাশে গুলি করা হয়েছে। উড়ে গেছে মাথার পেছনের অর্ধেকটা ।

"সবাই..." তানভীর কথা শেষ করার আগেই ওদের আশপাথ থেকে একসাথে বেশ কয়েকটা অস্ত্র লোড করার শব্দ পাওয়া গেল।

"হল্ট, সবাই যার যার অস্ত্র নামিয়ে রাখুন, প্রত্যেকের হাত মাথার ওপরে দেখতে চাই।"

ওদের টিম সেটা তো করলোই না উল্টো প্রত্যেকেই যার যার অস্ত্র তুলে ধরলো ওদের চারপাশে।

"মি. তানভীর, অস্ত্র ফেলে দিন, না-হলে এই নিরীহ ছেলেটা মারা যাবে," ওরা তাকিয়ে দেখেলো ঝাউ বনের ভেতর থেকে একদল অস্ত্রধারি বেরিয়ে এসেছে। চাঁদের হালকা আলোয় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সবাইকে।

সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কটা চোখের সেই খুনি, আফসার। সে একটা পিস্তল ধরে আছে মিঠুর কপালের পাশে। ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভার। তানভীর বুঝতে পারলো, এই ব্যাটাই আফসারকে সব তথ্য সরবরাহ করেছে।

তানভীর কী করবে সেটা ভাবার আগেই একজন কমান্ডো অস্ত্র তুললো ওদের দিকে, সাথে সাথে তার গলায় গুলি করে ফেলে দেয়া হলো।

"প্রথমবার ছিলো, তাই ছেলেটাকে মারলাম না। এবার কিন্তু..." ও কথা শেষ করার আগেই তানভীর অস্ত্র ফেলে দিলো। ওর পাশের অফিসারদেরও ইশারা করলো একই কাজ করার জন্যে।

"ভেরি গুড, এবার মিস তুলি, আপনি সাবধানে হেটে এগিয়ে আসুন।"

তুলি তানভীরের দিকে তাকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করে এগিয়ে যেতে লাগলো। সে একেবারে কটা চোখের খুনির সামনে গিয়ে থামলো। এগিয়ে ধরলো ব্রিফকেসটা।

"দুনিয়াটা খুবই ছোট জায়গা, মিস তুলি। হাসপাতালে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে থ্যাঙ্কসটাও ঠিকমতো বললেন না," বলে সে একটানে নিয়ে নিলো ব্রিফকেসটা। "জাফর সাদেকের হাত ধরেই আমি এ পথে এসেছিলাম। এই জিনিস কেউ যদি সবচেয়ে বেশি ডিজার্ভ করে সেটা আমি। আমাকে একজন নিয়োগ দিলেও তাকে এটা দেয়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। এখন এটা আমার। বলে সে হাটু গেড়ে বসে পড়লো মাটিতে। ব্রিফকেসটা খোলার চেষ্টা করতেই বুঝলো এটা লক করা, কম্বিনেশন ছাড়া খুলবে না।

"কম্বিনেশন, মিস তুলি। আমার ধারণা আপনি সেটা জানেন।"

"আমি জানি না," তুলি দৃঢ় স্বরে বলল।

খুনি সোজা পিস্তল তুললো ওর চোখ বরাবর। "তিন গুনবো, এরমধ্যে না বললে..." তুলি চোখ বন্ধ করে ফেললো।

"আমি তিন গুনবো, এরমধ্যে ওটা তুমি আমার দিকে ছুঁড়ে দেবে, আফসার," অরেকটা খটখটে ভাঙা কণ্ঠ বলে উঠলো ওদের পেছন থেকে।

তুলি অবাক হয়ে চোখ খুলে দেখলো ওদের টিমকে ঘিরে আছে কটা চোখের খুনির দল আর ওদেরকে কভার করে আছে সেই লম্বুর দল। "আফসার, একদম চালাকি করবে না। তুমিও জানো আমি কে, আর আমিও জানি তুমি কি। কাজেই সাবধান। একটু এদিক ওদিক করেছো তো

খুলি উড়িয়ে দেবো।"

তানভীর দেখলো, এই সুযোগ। সে একজন অফিসারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো।

"তানভীরসাহেব, বেশি চালাকি করবেন না," বলে সে এগিয়ে এসে প্রথমে আফসারের হাত থেকে টান দিয়ে ব্রিফকেসটা নিয়ে নিলো। এরপর এগিয়ে এলো তানভীরের দিকে ।

"আপনার কি ধারণা আমরা এই পর্যন্ত আপনাদের অনুসরণ করলাম কিভাবে? সবখানেই ঝামেলা আছে, মি. তানভীর। তাই না?" শেষ শব্দটা সে তানভীরদের টিমের এক অফিসারের উদ্দেশ্যে বলে সামান্য হাসলো।

সাথে সাথে অফিসার লোকটা কোমর থেকে পিস্তল বের করে সেটা পাশের অফিসারের মাথায় ঠেকিয়ে টিপে দিলো ট্রিগার।

"না," চিৎকার করে উঠলো তানভীর। তার দলের এতো ভেতরে বেঈমান ছিলো সে ভাবতেও পারেনি।

"খবরদার, কেউ এতোটুকু নড়লেই মেরে ফেলা হবে," লম্বু চিৎকার করে উঠলো।

সে তুলির সামনে এসে তার হাতের পিস্তলটা সোজা ওর কপালে ঠেকিয়ে বলল, "মিস তুলি, আপনি একবার আমার হাত থেকে পালিয়েছেন। আমি দ্বিতীয়বার সে সুযোগ দেবো না। হয় পাসওয়ার্ড বলবেন, না-হয় মরবেন।"

তুলি কিছুই না বলে বিড়বিড় করে পাসওয়ার্ডটা বলে দিলো।

"সাবাশ। এই তো কাজ হচ্ছে," লম্বু খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো। "এদের সবাইকে নিরস্ত্র করে লাইনে দাঁড় করাও। আমি এটা চেক করে সিগন্যাল দিলেই গুলি করে ফেলে দেবে সবকটাকে," বলার সাথে সাথে ওর দলের লোকজন সবাইকে নিরস্ত্র করে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলো। তুলি, তানভীর আর আফসার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সাথে মিঠু।

লম্বু ব্রিফকেসটাকে ওদেরই একটা পাজেরোর বনেটের ওপর রেখে কম্বিনেশন মেলাতে লাগলো। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে একটা একটা করে নম্বর মেলালো। শেষ নম্বরটা দিতেই কট করে খুলে গেল তালা। সে একগাল হেসে ডালাটা মেলে ধরতেই তার হাসি মুখেই রয়ে গেল।

তীব্র বিস্ফোরণে তার দেহ আর গাড়ি দুটোই সাথে সাথে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গাড়ি বিস্ফোরণ রূপ নিলো দাবদাহে। ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো চারপাশ। প্রথম গাড়িটা বিস্ফোরিত হয়ে উড়ে গিয়ে পড়লো দ্বিতীয়টার ওপরে। ওটাও বিস্ফোরিত হলো খানিক পরেই।

ব্রিফকেসটা বিস্ফোরিত হবার ঠিক আগ মুহূর্তে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলো তুলি, দেখলো ওর সাথে সাথে তানভীরও শুয়ে পড়েছে। তানভীর মাটিতে শুয়েই তুলিকে আড়াল করে গড়িয়ে সরে এলো একপাশে। এমন সময় বিস্ফোরিত হলো প্রথম গাড়ি এর একটু পরেই দ্বিতীয়টা। লাইন ধরে দাড়িয়ে থাকা প্রতিটা মানুষ হয় বিস্ফোণের ধাক্কায় উড়ে গেল, না-হয় পরিণত হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে। তানভীর দেখলো আফসারের সমস্ত দেহ মশালের মতো জ্বলছে।

বিস্ফোরোণের শকে তুলির কান দিয়ে রক্ত পড়ছে। ও দেখলো একটা হাত ওকে টেনে দাঁড় করালো তারপর জড়িয়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো পোর্টের দিকে। একটু এগোতেই ওরা দুটো গাড়ি দাঁড় করানো দেখতে পেলো বিচের কাছে। একটা গাড়ির দরজা খোলা দেখে ওটাতে ঢুকে স্টার্ট করে দিলো তানভীর। গাড়ির খোলা দরজা, ইগনিশনে চাবি লাগানো। তানভীর অনুমান করলো, হয় আফসার না-হয় লম্বুর দলের লোকজন নিয়ে এসেছিলো এই গাড়িদুটো।

গাড়ি স্টার্ট করে সোজা টান দিয়ে ও গাড়িটাকে তুলে নিয়ে এলো হাইওয়েতে।

পরিশিষ্ট

তানভীর গাড়ি চালাচ্ছে একমনে। এরইমধ্যে সে হেডকোয়ার্টার আর লোকাল পুলিশে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।

তুলি বসে আছে শান্ত হয়ে। মুখের আর কানের রক্ত মুছে নিয়েছে সে। এখন অনেকটাই শান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

"ওখানে ঠিক কী হলো বলতে পারবেন? ব্রিফকেসটা বিস্ফোরিত হলো কিভাবে? অপনি কি ওকে ভুল পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন?" তানভীর গাড়ি চালাতে চালাতে গম্ভীর মুখে জানতে চাইলো।

"না, আমি ওকে ঠিক পাসওয়ার্ডই দিয়েছিলাম। কিন্তু ব্রিফকেসটাই ছিলো একটা বোমা। ওটাকে যে-ই খুলতো সে-ই মরতো," তুলির গলা একেবারে নির্বিকার।

"মানে?" তানভীর অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"মানে, খুব সহজ। আমি শিপের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে যখন ব্রিফকেসটা নেই তখন ক্যাপ্টেনই আমাকে জানায় এই ব্রিফকেসটাকে চাইলে একটা বোমায় পরিণত করা যায়। আমি জানতাম আমাদের পেছনে লোক লাগবেই। তাই আমি ব্রিফকেসের জিনিস সব বের করে আমার এই ব্যাগে ভরে ফেলি," বলে ও নিজের হাতব্যাগটা দেখালো। তারপর ব্রিফকেসের বোমাটা অ্যাকটিভ করে দেই ক্যাপ্টেনের সহায়তায়।"

"তার মানে...তার মানে, আপনি বলছেন, ব্রিফকেসের জিনিস সব আপনার কাছে রয়ে গেছে?"

"অবশ্যই। সব আমার এই ব্যাগের ভেতরেই আছে। এই যে দেখুন," বলে ও কালো মোটা কাপড়ে মোড়ানো একটা বড় প্যাকেট দেখালো। "এর ভেতরেই সব আছে। তথ্য, ডায়মন্ড থেকে শুরু করে, রাইট করা বেশ কিছু ডিভিডি, একটা পোর্টেবল হার্ডডিস্ক, বেশ কয়েক বান্ডিল দলিল-দস্তাবেজ, কিছু ডলারসহ কয়েকটি দেশের কারেন্সি পর্যন্ত; যা যা আপনারা খুঁজছিলেন সব।"

"দারুণ...দারুণ দেখালেন আপনি। আমি এখনো বিশ্বাসই করতে

পারছি না," তানভীরের চোখে-মুখে খুশির বন্যা। "আমি এক্ষুনি হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করে দিচ্ছি।"

"ধীরে, মি. তানভীর, ধীরে। আগেই এতো খুশি হবেন না।"

"মানে?" তানভীর অবাক হয়ে তুলি দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো তুলির হাতে ওর দেয়া সেই গ্লক পিস্তলটা। "কি ব্যাপার, আপনি..."

"কোন কথা না বলে আগে গাড়িটাকে রাস্তার পাশে সাইড করে রাখুন। তারপর দু-হাত হুইলে রেখে বসে থাকুন চুপচাপ। আজ অনেক খুনোখুনি হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে, আরো হোক আমি তা চাই না," বলে সে পিস্তল নাড়লো।

তানভীর চুপচাপ তাই করলো। সে গাড়িটাকে সাইড করে রাস্তার পাশে রেখে দু-হাত হুইলে রাখলো। মৃদু স্বরে জানতে চাইলো, "কিন্তু কেন?"

"আমি আপনার কথার জবাব দেবো কিন্তু তার আগে আপনি আমার একটা কথার জবাব দিন। জাফর সাদেকের রাইট হ্যান্ড মোস্তাক আগ্রাবাদে কেন গেছিলো?"

"আমরা তো সেটা জানতে পারিনি।"

"পুরো চট্টগ্রামে এতো জায়গা থাকতে লাইফ-লাইন হাসপাতালের আশেপাশেই কেন ঘোরাঘুরি করছিলো সে?"

তানভীর কিছু না বলে বোকার মতো মাথা নাড়লো।

"কারণ সে ওখানে আমার সাথে দেখা করতে গেছিলো।"

"কি! কিন্তু কেন?"

"কারণ সে জাফর সাদেকের মৃত্যুর আগে মোস্তাকের কাছে শেষ যে অনুরোধটা করেছিলো মোস্তাক সেই অনুরোধ রাখতেই আগ্রাবাদ গেছিলো সেদিন। অনুরোধটা কি ছিলো, জানেন? সে জাফর সাদেকের একমাত্র কন্যার হাতে তার শেষ সম্পদটা পৌছে দিতে।"

"মানে...আ-আপনি...?"

"হুম। আপনার মনে একবারও এই প্রশ্ন জাগলো না? কাল রাতে এতো দৌড়-ঝাপের পরও কেন আমি নিজে এলাম এগুলো উদ্ধার করতে। আমার জায়গায় অন্য যে কেউ হলে আপনাদেরকে এগুলোর হদিস জানিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্যে উতলা হয়ে উঠতো। সেখানে আমি আগ্রহি ছিলাম আপনাদের সাথে এগুলো উদ্ধার করতে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না? কিন্তু

এই ছোট্ট অস্বাভাবিক ব্যাপারটাই আপনাদের চোখে পড়েনি কারণ আপনারা আমার ব্যাপারে মনোযোগই দেননি। আপনাদের সমস্ত মনোযোগ ছিলো কিভাবে অন্যদের হাত এড়িয়ে জিনিসগুলো উদ্ধার করবেন সেদিকে। আপনার বস ওয়াজেদসাহেব চাচ্ছিলেন জিনিসগুলো ঠিকভাবে উদ্ধার হোক, সেজন্যে আমার মতো নিরীহ একটা মেয়েকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতেও উনার বাঁধেনি।"

"কিন্তু আমরা তো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড থরো চেক করেছিলাম। সেখানে তো..."

"কি পেয়েছিলেন? আমার ভাই ছোটবেলা মারা গেছে। স্কুল টিচার মা মারা গেছেন গত বছর। আর বাবা মিডল-ইস্টে থাকতেন, মারা গেছেন অনেক আগে। তাই তো। মা আর ভাইয়ের ব্যাপারটা ঠিক থাকলেও বাবার পরিচয়টা সাজানো ছিলো বহু আগে থেকে। এক রাতের চেক-আপে এগুলো ধরা সম্ভব ছিলো না।"

"কিন্তু আমরা কেন...মানে, আপনি তো নিজেই..."

"পারতাম না, মি. তানভীর। কারণ আমি জানতাম আপনাদের সহায়তা ছাড়া এতোগুলো গ্যাঙের সাথে মোকাবেলা করে এক রাতে আমি একা জীবনেও এগুলো উদ্ধার করতে পারতাম না। আপনারা চাইছিলেন আমাকে ব্যবহার করতে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আমিই আপনাদের ব্যবহার করেছি," বলে ও একটু থামলো। "আমার বাবা, যে কোনদিন আমাদের আপন হতে পারেনি, যে কোনদিনই তার কোন দায়িত্ব পালন করতে পারেনি, যে সবসময়ই...যাই হোক, এটা আমার প্রাপ্য সম্পদ। আমি এটা নিয়ে যাবো। ওই কটা চোখের খুনি শেষ পর্যন্ত আগুনে পুড়ে মরলো। লম্বু মরলো বিস্ফোরণে। আর এখন আপনি..."

তানভীর কিছু না বলে ঢোক গিললো।

"আপনি আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। আপনাকে আমি মারবো না। আমি জানি আপনি আমার পিছু নেবেন, তবুও আমি আপনাকে মারতে পারবো না। আমার বাবা খুনি ছিলো, আমি না। আমি খুবই সাধারণ এক মেয়ে, যে কষ্ট করে সৎপথে বাঁচতে চেয়েছিলো কিন্তু সবাই মিলে আমাকে...যাই হোক, এখন আপনি প্রথমে আপনার পিস্তল, ওয়ালেট, মোবাইল আর আইডি খুব সাবধানে বের করে ওখানে রাখুন। এরপর গাড়ি

থেকে নামবেন। উল্টো হেটে দশ কদম যাবেন। উল্টা-পাল্টা করলেই আমি ট্রিগার টিপে দেবো।”

তানভীর কোন উল্টা-পাল্টা কিছু করলো না। সে জিনিসগুলো রেখে গাড়ির বাইরে গিয়ে রাস্তা থেকে নেমে উল্টো হয়ে দাঁড়ালো। পেছনে শুনতে পেলো গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে ডাক্তার তুলি বলে উঠলো, “গুডবাই, মি. অফিসার।”

গাড়িটা চলতে শুরু করতেই তানভীর দৌড়ে এসে উঠলো রাস্তায়।

পেছন থেকে সে দেখতে পেলো হাইওয়ে ধরে পঙ্খিরাজের মতো উড়ে চলেছে গাড়িটা।